সিয়াম বিষয়ক নির্বাচিত ফাতাওয়া

[Bengali - বাংলা - بنغالي]



ইসলাম কিউ. এ

অনুবাদ: ইবতিসাম আযাদুর রহমান

সম্পাদনা: ড .আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

فتاوى مختارة عن الصيام



موقع الإسلام سؤال وجواب



ترجمة: ابتسام آزاد الرحمن
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

	করা।	

রমযান মাসের আগমন উপলক্ষে আমরা কীভাবে প্রস্তুতি নেব?

ফাতওয়া নং ৯২৭৪৮

প্রশ্ন: আমরা কীভাবে রমযানের জন্য প্রস্তুতি নিব? এই মহান মাসে কোন কাজটি সর্বোত্তম?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত: সম্মানিত ভাই, আপনি প্রশ্নটি করে বেশ ভালো করেছেন। কারণ, আপনি রমযান মাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যখন সিয়ামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বহু মানুষের ধ্যান ধারণা বিকৃত হয়েছে। তারা এই মাসকে খাদ্য, পানীয়, মিষ্টি-মণ্ডা, রাত জাগা ও স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর মৌসুম বানিয়ে ফেলেছে। আর এ জন্য তারা রমযান মাসের বেশ আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এই আশংকায় যে কিছু খাদ্য দ্রব্য কেনা বাদ পড়তে পারে বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই তারা খাদ্য দ্রব্য কিনে, হরেক রকম পানীয় প্রস্তুত করে এবং কী অনুষ্ঠান দেখবে আর কী দেখবে না তা জানতে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর গাইড খোঁজ খবর করে প্রস্তুতি নেয়।

আর এভাবে তারা রমযান মাসের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই অজ্ঞ থেকে গেল। তারা এ মাস থেকে ইবাদাত ও তাকওয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিল এবং একে তাদের উদরপূর্তি ও চক্ষুবিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করল।

দ্বিতীয়ত: অপরদিকে অন্যরা রমযান মাসের সিয়ামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে শা‘বান মাস থেকেই এর প্রস্তুতি নিতে শুরু

করে, এমনকি তাদের কেউ কেউ এর আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

রমযান মাস উপলক্ষে প্রস্তুতি নেওয়ার কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হলো:

১. সত্যিকার তাওবা:

আর এটি সবসময়ের জন্যই ওয়াজিব, তবে যেহেতু এক মহান মুবারাক (বরকতময়) মাসের দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে তাই তার ও তার রবের মাঝে যে গুনাহগুলো আছে এবং তার ও মানুষের মাঝে যে অধিকারসমূহ রয়েছে সেগুলো থেকে দ্রুত তাওবা করার জন্য তার আরও বেশি তৎপর হওয়া উচিৎ; যাতে করে সে এই মুবারক (বরকতময়) মাসে পবিত্র মন ও প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করে আনুগত্য ও ইবাদাতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: ٣١]

"আর তোমরা সবাই, হে মুমিনেরা, আল্লাহর কাছে তাওবা কর যাতে করে সফলকাম হতে পার।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

আল-আগার ইবন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»

"হে লোক সকল, আপনারা আল্লাহর কাছে তাওবা করুন। কারণ, আমি দিনে তাঁর কাছে ১০০ বার তাওবা করি।"[1]

২. দো'আ পাঠ:

---

[1] সহীহ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭০২।

কোনো কোনো পূর্বসূরী (সাহাবীগণ, তাবে‘ঈনগণ .....) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা ৬ মাস ধরে আল্লাহর কাছে দো‘আ করতেন যাতে তিনি তাদের রমযান মাস পাওয়ার তাওফীক দেন, এরপর (রমযান শেষে) ৫ মাস ধরে এই দো‘আ করতেন যেন (রমযানের আমলসমূহ) তাদের কাছ থেকে কবুল করা হয়।

তাই একজন মুসলিম তার রবের কাছে দো‘আ করবে যাতে তিনি তাকে রমযান মাস পাবার তাওফীক দেন সর্বোত্তম দীনি অবস্থা ও শারীরিক সুস্থতার মাঝে এবং তাঁর কাছে এই দো‘আ করবে যাতে তিনি তাকে তাঁর আনুগত্যে সাহায্য করেন এবং তাঁর কাছে এই দো‘আ করবে যাতে তিনি তার আমল কবুল করেন।

৩. এই মহান মাসের আসন্ন আগমনে আনন্দিত হওয়া:

রমযান মাসের আগমন একজন মুসলিম বান্দার প্রতি আল্লাহর সুমহান নি‘আমাতগুলোর (অনুগ্রহসমূহের) একটি। কারণ, রমযান কল্যাণময় একটি মওসুম। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটি হলো কুরআনের মাস, আমাদের দীনের গুরুত্বপূর্ণ, চূড়ান্ত সংগ্রামের মাস। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨﴾ [يونس: ٥٨]

“বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়, অতঃপর এর দ্বারা তারা আনন্দিত হোক; তা, তারা যা সঞ্চয় করে তা থেকে উত্তম।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৮]

৪. ওয়াজিব সিয়াম থেকে নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত করা:

আবু সালামাহ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন,

«سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ».

"আবু সালামাহ বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলতে শুনেছি, "আমার ওপর বিগত রমযানের সাওম বাকি থাকত, যার কাযা আমি শা'বান ছাড়া আদায় করতে পারতাম না।"[2]

হাফেয ইবন হাজার রহ. বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক শা'বান মাসে রমযানের সিয়াম পালনের চেষ্টা প্রমাণ করে যে, এক রমযান এর কাযা আরেক রমযান প্রবেশ করা পর্যন্ত দেরী করা জায়েয নয়।[3]

৫. পর্যাপ্ত ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা, যাতে সিয়ামের হুকুম-বিধি-বিধান এবং রমযান মাসের মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়।

৬. রমযান মাসের ইবাদাত থেকে একজন মুসলিমকে বিরত করতে পারে এমন কাজসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা।

৭. পরিবারের সদস্যবর্গ যেমন, স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বসে তাদেরকে সিয়ামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া এবং ছোটদের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৪৯; সহীহ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪৬।

[3] ফাতহুল বারী (৪/১৯১)।

৮. কিছু বই প্রস্তুত করা যা বাড়িতে বসে পড়া সম্ভব বা মসজিদের ইমামকে উপহার দেওয়া, যা তিনি রমযান মাসে লোকদের পড়ে শোনাবেন।

৯. রমযান মাসের প্রস্তুতি স্বরূপ শা‘বান মাস থেকেই সিয়াম পালন শুরু করা।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে সিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলতাম তিনি আর সিয়াম ভঙ্গ করবেন না এবং এমনভাবে সিয়াম ভঙ্গ করতেন যে আমরা বলতাম, তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসের গোটা অংশ সাওম পালন করতে দেখি নি এবং শা‘বান ছাড়া অন্য কোনো মাসে অধিক সিয়াম পালন করতে দেখি নি।”[4]

উসামা ইবন যাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ: (ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৬।

“আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে শা‘বান মাসের মত অন্য কোনো মাসে এত সাওম পালন করতে দেখি নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এটি রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী একটি মাস, যখন মানুষ গাফিল হয় এবং এমন মাস যখন আমলসমূহ রাব্বুল ‘আলামীনের কাছে উঠানো হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে আমার আমল আমি সাওম পালন রত অবস্থায় উঠানো হবে।”[5]

শা‘বান মাসের সাওম পালনের হিকমতের বর্ণনায় হাদীসে এসেছে যে এটি এমন মাস যখন আমলসমূহ উঠানো হয়। আলেমগণের মাঝে কেউ কেউ অন্যান্য হিকমাহসমূহ উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো শা‘বানের সাওম ফরয সালাতের পূর্বের সুন্নাহ্‌র মত যা ফরয আদায়ে মনকে প্রস্তুত করে ও উৎসাহ যোগায়। ঠিক একই বক্তব্য প্রযোজ্য রমযানের পূর্বে শা‘বানের সিয়ামের ক্ষেত্রে।

১০. কুরআন তিলাওয়াত:

সালামাহ ইবন কুহাইল বলেছেন, “শা‘বান মাসকে ক্বারীগণের মাস বলা হত।”

আমর ইবন কাইস, শা‘বান মাস শুরু হলে, তার দোকান বন্ধ করে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অবসর নিতেন।

5 নাসাঈ, হাদীস নং ২৩৫৭ এবং আলবানী একে সহীহ আন-নাসাঈতে হাসান বলেছেন।

আবু বকর আল-বালাখী বলেছেন, “রজব মাস হলো বীজ বপনের মাস, শা‘বান মাস হলো ক্ষেতে সেচ প্রদানের মাস এবং রমযান মাস হলো ফসল তোলার মাস।”

তিনি আরও বলেছেন, “রজব মাসের উদাহরণ হলো বাতাসের ন্যায়, শা‘বান মাসের উদাহরণ মেঘের ন্যায়, রমযান মাসের উদাহরণ বৃষ্টির ন্যায়। তাই যে রজব মাসে বীজ বপন করল না, শা‘বান মাসে সেচ প্রদান করল না, সে কীভাবে রমযান মাসে ফসল তুলতে চাইতে পারে?”

এখন রজব মাস গত হয়েছে, আর আপনি শা‘বান মাসে কি করবেন যদি রমযান মাস পেতে চান? এ হলো এই বরকতময় মাসে আপনার নবী ও উম্মাতের পূর্বসূরীগণের অবস্থা। এ সমস্ত আমল ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান কী হবে?

তৃতীয়ত: রমযান মাসে একজন মুসলিমের কী করা উচিৎ সে আমলসমূহ সম্পর্কে জানতে দেখুন (২৬৮৬৯) ও (১২৪৬৮) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই তাওফীকদাতা।

ইসলাম কিউ.এ

রমযান মাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ফাতওয়া নং ১৩৪৮০

প্রশ্ন: রমযান কী?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রমযান...এটি ‘আরবী’ বার মাসগুলোর একটি। আর এটি দীন ইসলামে একটি সম্মানিত মাস। এটি অন্যান্য মাস থেকে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও ফযিলতসমূহ-এর কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন:

১. আল্লাহ তা‘আলা সাওমকে (রোযাকে) ইসলামের আরকানের মধ্যে চতুর্থ রুকন হিসেবে স্থান দিয়েছেন, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“রমযান মাস যে মাসে আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এই মাস পায় সে যেন সাওম পালন করে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

ইবন উমার এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت»

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রমযান মাসে সাওম পালন করা এবং (৫) বাইতুল্লাহ’র (কা‘বা-এর) উদ্দেশ্যে হজ করা”।[6]

২. আল্লাহ তা‘আলা এই মাসে আল-কুরআন নাযিল করেছেন, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“রমযান মাস যে মাসে তিনি আল-কুরআন নাযিল করেছেন, তা মানবজাতির জন্য হিদায়াতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন।” [আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

তিনি - সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলা- আরও বলেছেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١﴾ [القدر: ١]

“নিশ্চয় আমরা একে (আল-কুরআন) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।” [সূরা আল-কদর, আয়াত: ১]

৩. আল্লাহ এ মাসে লাইলাতুল কদর রেখেছেন, যে মাস হাজার মাস থেকে উত্তম, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥ ﴾ [القدر: ١، ٥]

[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

“১. নিশ্চয় আমরা একে লাইলাতুল কদরে (আল-কুরআন) নাযিল করেছি ২. এবং আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কী?
৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম। ৪. এতে ফিরিশতাগণ এবং রূহ (জিবরীল আলাইহিস সালাম) তাদের রবের অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে। ৫. শান্তিময় (বা নিরাপত্তাপূর্ণ) সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।” [সূরা আল-কদর, আয়াত: ১-৫]
তিনি আরও বলেছেন,
﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣﴾ [الدخان: ٣]
“নিশ্চয় আমরা একে (আল-কুরআন) এক মুবারাক (বরকতময়) রাতে নাযিল করেছি, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।” [সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩]
আল্লাহ তা‘আলা রমযান মাসকে লাইলাতুল কদর দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আর এই মুবারাক (বরকতময়) রাতে মর্যাদার বর্ণনায় সূরাতুল কদর নাযিল করেছেন।
আর এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে অনেক হাদীস। তন্মধ্যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ».

“তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে রমযান, এক মুবারাক (বরকতময়) মাস। এ মাসে সিয়াম পালন করা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ওপর ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, এ মাসে অবাধ্য শয়তানদের শেকলবদ্ধ করা হয়, আর এ মাসে রয়েছে আল্লাহর এক রাত যা হাজার মাস থেকে উত্তম, যে এ রাত থেকে বঞ্চিত হলো, সে প্রকৃত পক্ষেই বঞ্চিত হলো।”[7]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“যে ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদর (কদরের রাত্রিতে) কিয়াম করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[8]

৪. আল্লাহ তা‘আলা এই মাসে ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় সিয়াম পালন ও কিয়াম করাকে গুনাহ মাফের কারণ করেছেন, যেমনটি দুই সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»

---

[7] নাসাঈ, হাদীস নং ২১০৬; আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৬৯ এবং আল-আলবানী একে ‘সাহীহুত তারগীব’ গ্রন্থে সহীহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন (৯৯৯)।

[8] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১০; সহীহ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬০।

“যে রমযান মাসে ঈমান সহকারে ও সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[9]

অনুরূপভাবে তার (আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»

“যে রমযান মাসে ঈমান সহকারে ও সাওয়াবের (প্রতিদানের) আশায় কিয়াম করবে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০০৮; সহীহ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৪)

মুসলিমদের মাঝে রমযানের রাতে কিয়াম করা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা‘ (ঐকমত্য) রয়েছে। ইমাম আন-নাওয়াউয়ী উল্লেখ করেছেন:

“রমযানে কিয়াম করার অর্থ হলো তারাউয়ীহের (তারাবীহের) সালাত আদায় করা অর্থাৎ তারাউয়ীহের (তারাবীহের) সালাত আদায়ের মাধ্যমে কিয়াম করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।”

৫. আল্লাহতা‘আলা এই মাসে জান্নাতসমূহের দরজাসমূহ খুলে দেন, এ মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন এবং শয়তানদের শেকলবদ্ধ করেন। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে দুই সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রার হাদীস থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا جـاء رمضــان فتحت أبــواب الجنــة , وغلقت أبــواب النار , وصُــفِّدت الشياطين»

---

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১৪; সহীহ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬০।

“যখন রমযান আবির্ভূত হয় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শেকলবদ্ধ করা হয়।”[10]

৬. এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে (তাঁর বান্দাদের) মুক্ত করেন। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لله عند كل فطر عتقاء»

“আল্লাহর রয়েছে প্রতি ফিতরে (ইফতারের সময় জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দারা।”[11]

অনুরূপ আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة»

“নিশ্চয় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার রয়েছে (রমযান মাসে) প্রতি দিনে ও রাতে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাগণ আর নিশ্চয় একজন মুসলিমের রয়েছে প্রতি দিনে ও রাতে কবুল যোগ্য দো‘আ।”[12]

৭. রমযান মাসে সাওম পালন করা পূর্ববর্তী রমযান থেকে কৃত গুনাহসমূহের কাফফারা লাভের কারণ যদি বড় গুনাহসমূহ (কবীরা

---

[10] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৭৯।

[11] আহমাদ (৫/২৫৬) আল-মুনযিরী বলেছেন, এর ইসনাদে কোনো সমস্যা নেই। আর আল-আলবানী এটিকে ‘সাহীহুত তারগীব’ (৯৮৭)-এ সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[12] আল-বাযযার (কাশফ ৯৬২)।

গুনাহসমূহ) থেকে বিরত থাকা হয়, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»

“পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু‘আ থেকে অপর জুমু‘আ, এক রমযান থেকে অপর রমযান, এর মাঝে কৃত গুনাহসমূহের কাফফারা করে যদি বড় গুনাহসমূহ (কবীরা গুনাহসমূহ) থেকে বিরত থাকা হয়।”

৮. এই মাসে সাওম পালন করা দশ মাসে সিয়াম পালন করার সমতুল্য যা ‘সহীহ মুসলিম’-এ প্রমাণিত আবু আইয়ূব আল-আনসারীর হাদীস থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন,

«من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر»

“যে রমযান মাসে সিয়াম পালন করল, এর পর শাউওয়ালের ছয়দিন সাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন সাওম রাখার সমতূল্য”।[13]

আর ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام السنة»

“যে রমযান মাসে সাওম পালন করল, তা দশ মাসের (সাওম পালনের) সমতূল্য আর ‘ঈদুল ফিত্বরের পর (শাউওয়ালের মাসের)

[13] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৪।

ছয় দিন সাওম পালন করা গোটা বছরের (সাওম পালনের) সমতূল্য।"[14]"[15]

৯. এই মাসে যে ইমামের সাথে, ইমাম সালাত শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত কিয়াম করে, সে সারা রাত কিয়াম করেছে বলে হিসাব করা হবে যা ইমাম ও অন্য সূত্রে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»

"যে ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর (ইমামের) সাথে কিয়াম করল, সে সারা রাত কিয়াম করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।"[16]

---

[14] বি.দ্র. সূরা আল-আন'আমের ১৬০ নং আয়াত অনুসারে কোনো মুমিন কোনো ভালো কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দশগুণ সাওয়াব দেন। সুবহানাল্লাহ! তাই রমযান মাসে ৩০ দিন সাওম পালনের অর্থ এই দাঁড়ায় (৩০×১০)=৩০০ দিন অর্থাৎ দশ মাস সিয়াম পালন করা। আর (শাউওয়াল মাসের) ছয় দিন সাওম পালন করার অর্থ দাঁড়ায় (৬×১০)=৬০ দিন অর্থাৎ দুই মাস সিয়াম পালন করা। সুতরাং রমযান ও এর পরবর্তী শাউওয়ালের ছয় দিন সাওম পালন করা (১০ মাস+২ মাস)= ১২ মাস অর্থাৎ গোটা বছরের সমতুল্য! "আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিসাব বিহীন রিযিক দান করেন"। (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৮)] (অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।)

[15] আহমাদ, হাদীস নং ২১৯০৬

[16] আবু দাঊদ (১৩৭০) আল-আলবানী 'সালাতুত-তারাউয়ীহ' বইতে (পৃ. ১৫) একে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।

১০. এই মাসে উমরা করা হজ করার সমতুল্য। ইমাম বুখারী ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক মহিলাকে প্রশ্ন করলেন:

«ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح ، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فـإن عمرة فيه تعدل حجة»

“কিসে আপনাকে আমাদের সাথে হজ করতে বাঁধা দিল?” তিনি (আনসারী মহিলা) বললেন: আমাদের শুধু পানি বহনকারী দু’টি উটই ছিল। তার স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে করে হজে গিয়েছেন। আর আমাদের পানি বহনের জন্য একটি পানি বহনকারী উট রেখে গেছেন।” তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, “তাহলে রমযান এলে আপনি উমরা করুন। কারণ, এ মাসে উমরা করা হজ করার সমতুল্য।”

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: “আমার সাথে হজ করার সমতুল্য।”[17]

১১. এ মাসে ই‘তিকাফ করা সুন্নাহ। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়মিতভাবে করতেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِـفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِـرَ مِنْ رَمَضَـانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»

---

[17] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৬।

“আল্লাহ তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) মৃত্যু না দেওয়া পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ দিনে ই‘তিকাফ করতেন। তার পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই‘তিকাফ করেছেন।”[18]

১২. রমযান মাসে কুরআন অধ্যয়ন ও তা বেশি বেশি তিলাওয়াত করা খুবই তাকীদের (তাগিদের) সাথে করণীয় এক মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) কাজ। আর কুরআন অধ্যয়ন হলো একজন অপরজনকে কুরআন পড়ে শোনাবে এবং অপরজনও তাকে তা পড়ে শোনাবে। আর তা মুস্তাহাব হওয়ার দালীল:

«أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ»

“জিবরীল রমযান মাসে প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন অধ্যয়ন করতেন।”[19]

কুরআন কিরাত সাধারণভাবে মুস্তাহাব, তবে রমযানে বেশি তাকীদযোগ্য।

১৩. রমযানে সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো মুস্তাহাব, যার দলীল যাইদ ইবন খালিদ আল-জুহানী থেকে বর্ণিত হাদীস, যাতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»

[18] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭২।

[19] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩০৮।

“যে কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার (যে ইফতার করালো) তাঁর (সাওম পালনকারীর) সমান সাওয়াব হবে, অথচ সেই সাওম পালনকারীর সাওয়াব কোনো অংশে কমে না”।[20]

দেখুন প্রশ্ন নং (১২৫৯৮)

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

[20] তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৭৪৬ এবং আল-আলবানী ‘সহীহ তিরমিযী (৬৪৭) তে একে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

চাঁদ উঠার বিভিন্ন উদয়স্থল সংক্রান্ত মতভেদ কি বিবেচনাযোগ্য? এ ব্যাপারে অমুসলিম দেশে মুসলিম কমিউনিটির অবস্থান

ফাতওয়া নং ১২৪৮

প্রশ্ন: আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কিছু মুসলিম ছাত্র। প্রতি বছর রমযান মাসের শুরুতে আমাদের একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা মুসলিমদের তিনটি দলে ভাগ করে দেয়:

১. এক দল, তারা যে দেশে বাস করে সে দেশের চাঁদ দেখে সাওম রাখে।

২. এক দল, যারা সউদী আরবে সিয়াম শুরু হলে সাওম পালন করে।

৩. এক দল, যারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম ছাত্র ইউনিয়নের খবর (নতুন চাঁদ দেখার) পৌঁছলে সাওম রাখে যারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে চাঁদ দেখার দায়িত্ব পালন করে। তারা (সেই মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন) দেশের কোনো স্থানে চাঁদ দেখলে বিভিন্ন সেন্টারসমূহে তা দেখার খবর পৌঁছে দেয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিমরা একই দিনে সাওম পালন করে, যদিও এই শহরগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থিত।

এক্ষেত্রে সিয়াম পালন, চাঁদ দেখা ও এ সংক্রান্ত খবরের ব্যাপারে কারা বেশি অনুসরণ যোগ্য?

আমাদের এ ব্যাপারে দয়া করে ফাতওয়া দিন, আল্লাহ আপনাদেরকে পুরস্কৃত করুন, সাওয়াব দিন।

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত: নতুন চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল থাকার ব্যাপারটি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা অবধারিতভাবে জানা বিষয়গুলোর একটি। যে ব্যাপারে আলেমগণের কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি, তবে মুসলিমদের আলেমগণের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনাযোগ্য কিনা তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল এবং তা বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার মাসআলাটি তাত্ত্বিক মাসআলাগুলোর একটি, যাতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। জ্ঞান ও দীনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞজনদের মাঝে এ ব্যাপারে ইখতিলাফ (দ্বিমত) আছে। আর এটি এমন একটি গ্রহণযোগ্য মতভেদ যে ব্যাপারে সঠিক মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ) দুইবার সাওয়াব পাবেন, ইজতিহাদ করার সাওয়াব ও সঠিক মত প্রদান করার সাওয়াব এবং ভুল মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ) শুধু ইজতিহাদ করার সাওয়াব পাবেন।

এই মাসআলাটিতে আলেমগণ দু'টি মত প্রদান করেছেন:

ক. তাদের কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেছেন।

খ. আবার তাদের কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেন নি। তবে উভয়পক্ষই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল দিয়েছেন, এমনকি একই পাঠ থেকে দলীল দিয়েছেন। কারণ, তা দু'টি মতের সপক্ষেই দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। আর তা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: ١٨٩]

“তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা মানুষের সময়সীমা (নির্ধারণ) ও হজ এর জন্য।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৯]

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»

“তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সাওম শুরু কর এবং নতুন চাঁদ দেখে সাওম শেষ কর।”[21]

আর এ ভিন্ন মতভেদের কারণ হলো পাঠ বোঝার ক্ষেত্রে ভিন্নতা হওয়া এবং এ ব্যাপারে দলীল দেওয়ার ক্ষেত্রে উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা।

তৃতীয়ত: চাঁদ দেখা সংক্রান্ত কমিটি নতুন চাঁদ হিসাবের সাহায্যে নিশ্চিত হবার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাথেকে বর্ণিত দলীলসমূহ গবেষণা করে দেখেছেন এবং তারা এ ব্যাপারে আলেমগণের বক্তব্য যাচাই করেছেন। এরপর তারা ইজমা‘ (ঐকমত্য) ক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব দ্বারা শরী‘আত সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে নতুন চাঁদ দেখা নিশ্চিত করার ব্যাপারটি বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর দলীল হিসেবে তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»

[21] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮১।

“তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সাওম শুরু কর এবং নতুন চাঁদ দেখে সাওম শেষ কর।”[22]

এবং তাঁর বাণী: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» “তোমরা তা (নতুন চাঁদ) না দেখা পর্যন্ত সাওম রেখো না ও তা (নতুন চাঁদ) না দেখা পর্যন্ত সাওম শেষ করো না”[23] ও এর অর্থে অন্যান্য দলীলসমূহও রয়েছে।

গবেষণা ও ফাতাওয়া ইস্যুকারী স্থায়ী কমিটি এ মত পোষণ করে যে, মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন (অথবা এ ধরণের অন্য কোনো সংস্থা যারা ইসলামী কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করে) অমুসলিম সরকার শাসিত দেশসমূহে সেখানে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য নতুন চাঁদ দেখা নিশ্চিত করার ব্যাপারে মুসলিম সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে।

আর পূর্বে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, এই ইউনিয়নের দু’টো মতের যে কোনো একটি মত (ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করা বা না করা) এর যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার আছে। এরপর তারা সেই মতকে সে দেশের সমস্ত মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করবে। আর সে মুসলিমদের সেই মতকে যা তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে তা ঐক্যের স্বার্থে, সিয়াম শুরুর জন্য এবং মতভেদ ও বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলার জন্য মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক।

---

[22] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮১।

[23] মালিক, হাদীস নং ৬৩৫।

এ সমস্ত দেশে যারা বাস করে তাদের উচিৎ নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তৎপর হওয়া, তাদের মাঝে এক বা একাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি তা (নতুন চাঁদ) দেখে তবে তারা সাওম পালন করবে এবং সেই ইউনিয়নকে খবর দিবে যাতে তারা সবার ওপর এটি প্রয়োগ করতে পারে। এটি হলো মাস শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে।

আর তা (মাস) শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে শাউওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা বা রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করার ব্যাপারে দুইজন 'আদল ব্যক্তির সাক্ষ্য অবশ্য প্রয়োজন। এর দলীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً»

“তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সাওম পালন কর এবং নতুন চাঁদ দেখে সাওম শেষ করো বা ঈদুল ফিতর আদায় কর। আর যদি নতুন চাঁদ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে দেখা না যায় তবে (মাসকে) ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।”

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ (১০/১০৯)

ইসলাম কিউ.এ

কেউ সাওম রেখে অন্য দেশে সফর করল, যেখানে সিয়াম দেরিতে শুরু হয়েছে, এক্ষেত্রে কি তাকে ৩১ দিন সাওম পালন করতে হবে?

ফাতওয়া নং ৪৫৫৪৫

প্রশ্ন: আমি যদি কোনো দেশে সাওম পালন করি এবং রমযান মাসের মাঝে অন্য দেশে ভ্রমণ করি, যেখানে রমযান এক দিন পর শুরু হয়েছে এবং তারা ৩০ দিন সাওম পালন করেছে, তবে কি আমাকে তাদের সাথে সিয়াম পালন করতে হবে? যদিও বা আমার ৩১ দিন সিয়াম পালন করতে হয়?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

যদি কোনো ব্যক্তি এক দেশে রমযান শুরু করার পর অন্য দেশে যায় যেখানে ‘ঈদুল ফিতর এক দিন দেরিতে আসে তাহলে সে সিয়াম পালন চালিয়ে যাবে যতদিন না দ্বিতীয় দেশের লোকেরা সিয়াম পালন শেষ করে।

শাইখ ইবন বায রহ.-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল ‘আমি পূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে এসেছি যেখানে হিজরী মাস সউদী আরবের চেয়ে একদিন দেরিতে শুরু হয়। রমযান মাসে আমি আমার দেশে যাব। আমি যদি সউদী আরবে সিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষ করি তাহলে আমার ৩১ দিন সাওম পালন করা হবে। আমাদের সিয়ামের ব্যাপারে হুকুম কী? আমি কতদিন সাওম পালন করব?

তিনি উত্তরে বলেন, ‘আপনি যদি সউদী আরব বা অন্য কোনো দেশে সিয়াম পালন শুরু করেন, কিন্তু নিজের দেশে গিয়ে বাকিটা পালন

করেন তাহলে আপনাদের দেশের লোকদের সাথেই সিয়াম ভঙ্গ করবেন যদিও বা তা ৩০ দিনের বেশি হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون»

"সাওম হলো সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) সাওম পালন কর, আর 'ঈদুল ফিতর হলো সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) সাওম ভঙ্গ কর।[24]"

কিন্তু আপনি যদি তা করতে গিয়ে ২৯ দিনের কম সাওম পালন করেন, তাহলে আপনাকে পরে এক দিন সাওম এর কাযা আদায় করে নিতে হবে। কারণ, রমযান মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না।'[25]

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন রহ.-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এক মুসলিম দেশ থেকে যদি আরেক দেশে যাওয়া হয় যেখানে লোকজন প্রথম দেশের চেয়ে এক দিন দেরিতে রমযান আরম্ভ করেছে, তবে সিয়াম পালনের বিধান কি হবে যখন দ্বিতীয় দেশের লোকজনকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি সিয়াম পালন করতে হয়? এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রে কী হবে?

তিনি উত্তরে বলেন, "যদি কেউ এক মুসলিম দেশ থেকে আরেক মুসলিম দেশে ভ্রমণ করে এবং সেই দেশে রমযান দেরিতে শুরু হয়, তবে তিনি ওই দেশের লোকরা সিয়াম ভঙ্গ না করা পর্যন্ত সিয়াম

[24] তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৭। (সম্পাদক)

[25] মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখ ইবন বায, (১৫/১৫৫)।

পালন করে যাবেন কারণ সাওম হলো সেদিন যেদিন লোকেরা (সকলে) সিয়াম পালন করে, আর 'ঈদুল ফিতর হলো সেদিন যেদিন লোকেরা (সকলে) ইফতার করে অর্থাৎ ঈদুল ফিতর পালন করে, আর 'ঈদুল আযহা হলো সেদিন যেদিন লোকেরা পশু যবেহ করে।

সে এই কাজ করবে যদিও বা এজন্য তাকে এক বা এর বেশি দিন সিয়াম পালন করতে হয়।

এটি সেই পরিস্থিতির অনুরূপ যখন সে এমন দেশে যায় যেখানে সূর্যাস্ত দেরীতে হয়, তবে সে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সাওম পালন করবে যদিও বা এর ফলে দুই বা তিন বা ততোধিক ঘণ্টা স্বাভাবিক দিন (চব্বিশ ঘণ্টা) থেকে বেড়ে যায়।

একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে যদি সে এমন কোনো দেশে যায় যেখানে নতুন চাঁদ এখনও দেখা যায় নি। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাওম শুরু করতে বা ইফতার করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না আমরা তা দেখি। তিনি বলেছেন,

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»

"তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে সাওম শুরু কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে ইফতার তথা সাওম সমাপ্ত কর।"

আর বিপরীত অবস্থার ক্ষেত্রে, যখন একজন ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায় যেখানে রমযান মাস প্রথম দেশের তুলনায় আগে শুরু হয়েছে, তবে তিনি তাদের সাথেই সাওম ভঙ্গ করবেন এবং যে কয়দিনের সাওম বাদ পড়েছে সেগুলো পরে কাযা করে নিবেন। যদি একদিন বাদ পড়ে, তবে একদিনের কাযা করবেন, যদি দুই দিন বাদ

পড়ে, তবে দুই দিনের। তিনি ২৮ দিন পর সাওম ভঙ্গ করলে, তাহলে দুই দিনের কাযা করবেন, যদি উভয় দেশেই মাস ৩০ দিনে শেষ হয়, আর এক দিনের কাযা করবেন যদি উভয় দেশে বা যে কোনো একটি দেশে ২৯ দিনে মাস শেষ হয়।”[26]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীনের কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেউ হয়ত বলবে যে, কেন আপনি বলছেন যে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি সাওম পালন করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাওমের কাযা পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন, “দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাওমের কাযা সাওম পালন করতে হবে। কারণ, মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না আর সে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি সাওম পালন করবে। কারণ, তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায় নি।

প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব সাওম ভঙ্গ কর, যদিও তোমার ২৯ দিন পূর্ণ হয় নি। কারণ, নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে আর নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর সাওম ভঙ্গ করা বাধ্যতামূলক, শাউওয়াল মাসের প্রথম দিন সাওম পালন করা নিষিদ্ধ। আর কেউ যদি ২৯ দিনের কম সাওম পালন করে থাকে, তাহলে তাকে ২৯ দিন পূরণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন। কারণ, যে দেশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রমযান চলছে, নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রমযান চলছে সেখানে কীভাবে সাওম ভঙ্গ করা যেতে পারে? তাই

[26] মাজমূ‘ ফাতাওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)।

আপনাকে সাওম পালন চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তাতে মাস বেড়ে যায়, তাহলে তা দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার মতো।"[27]

আরও দেখুন ৩৮১০১ নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

[27] মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ২৫)।

কাদের ওপর রমযানের সাওম পালন করা ওয়াজিব?

ফাতওয়া নং ২৬৮১৪

প্রশ্ন: কাদের ওপর রমযানের সাওম পালন করা ওয়াজিব?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যে ব্যক্তির মধ্যে ৫টি শর্ত পাওয়া যায় তার ওপর সাওম পালন করা ওয়াজিব। যথা-

প্রথমত: যদি সে মুসলিম হয়

দ্বিতীয়ত: যদি সে মুকাল্লাফ (যার ওপর শরী'আতের বিধি-বিধান প্রযোজ্য) হয়

তৃতীয়ত: যদি সে সাওম পালন করতে সক্ষম হয়

চতুর্থত: যদি সে অবস্থানকারী (মুকিম) হয়

পঞ্চমত: যদি সাওম পালনে বাধাদানকারী বিষয়সমূহ তার মধ্যে না পাওয়া যায়

এই পাঁচটি শর্ত যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় তার ওপর সাওম পালন করা ওয়াজিব।

প্রথম শর্ত মুসলিম হওয়া: প্রথম শর্তের মাধ্যমে একজন কাফির ব্যক্তি এর আওতা বহির্ভূত হয়। একজন কাফিরের জন্য সাওম বাধ্যতামূলক নয়, আর সে তা পালন করলেও শুদ্ধ হবে না। আর যদি সে ইসলাম কবুল করে, তাহলে তাকে সেই দিনগুলোর কাযা করতে আদেশ করা হবে না।

আর এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ ٥٤ ﴾ [التوبة: ٥٤]

“আর তাদের দানসমূহ কবুল হতে এটিই বাঁধা দিয়েছিল যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ) এর সাথে কুফুরী করেছিল এবং তারা শুধু অলসতা বশতই সালাতে উপস্থিত হত আর তারা শুধু বাধ্য হয়েই অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করত।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৪]

আর যদি দান-সদকা যার উপকার বহুমুখী, তা তাদের কুফুরীর কারণে কবুল হয় না, তাহলে বিশেষ ইবাদাতসমূহ (যার উপকার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ) সেগুলো আরও বেশি কবুল না হওয়ার যোগ্য।

আর সে যদি ইসলাম কবুল করে তবে তার কাযা না আদায় করার দলীল হলো তাঁর-তা‘আলার বাণী:

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨ ﴾ [الانفال: ٣٨]

“আপনি তাদেরকে বলুন যারা অবিশ্বাস করেছে যদি তারা বিরত থাকে, তবে তাদের পূর্বে যা গত হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮]

আর এটি তাওয়াতুর (প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, ধারাবাহিক) সূত্রে রাসূল থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে ছুটে যাওয়া ওয়াজিবসমূহের কাযা করতে আদেশ করতেন না।

আর একজন কাফির যদি ইসলাম কবুল না করে তবে কি সে সিয়াম ত্যাগ করার জন্য আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, সে (সেই কাফির) তা (সাওম পালন) ত্যাগ করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, আর সে সমস্ত ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করার জন্যও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কারণ, আল্লাহর প্রতি অনুগত শরী'আতের বিধান পালনকারী, একজন মুসলিম যদি শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে একজন অহংকারী (কাফির) শাস্তি পাওয়ার আরও বেশি যোগ্য। একজন কাফির যদি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ যেমন, খাবার, পানীয় ও পোশাক ইত্যাদি উপভোগ করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে হারাম কাজ করা ও ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করার জন্য শাস্তি পাওয়ার আরও বেশি যোগ্য আর এটি হলো কিয়াস।

আর কুরআন থেকে (এর) দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা ডান পাশে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা অপরাধীদেরকে (কাফিরদের) বলবেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٦]

“কিসে তোমাদেরকে সাক্বারে (একটি জাহান্নামের নাম) প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে: আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না, আর আমরা মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম না, আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম, আর আমরা প্রতিফল

দিবসকে অস্বীকার করতাম।” [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৬] সুতরাং এ চারটি বিষয়ই তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে।

(১) “আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না”, সালাত

(২) “আমরা মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম না”, যাকাত

(৩) “আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম”, যেমন, আল্লাহর আয়াতসমূহকে বিদ্রূপ ইত্যাদি করা

(৪) “আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম”।

দ্বিতীয় শর্ত: যদি সে মুকাল্লাফ (শারী‘আতসম্মতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত) হয়, আর মুকাল্লাফ হলো বালিগ, আক্বিল (বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন) হওয়া। কারণ, ছোট শিশু ও পাগলের ওপর কোনো তাকলীফ (শারী‘আতের বিধি-বিধান) প্রযোজ্য হয় না।

আর বালিগ হওয়া তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি পাওয়া গেলে সাব্যস্ত হয়। (প্রশ্ন নং ২০৪৭৫-এ পাবেন)

আর আক্বিলের বিপরীত হলো পাগল, অর্থাৎ যে ‘আক্বল (বুদ্ধি-বিবেক) হারিয়েছে এমন পাগল, আর তাই তার ‘আক্বল-বুদ্ধি যে কোনো দিক থেকে হারিয়ে ফেলুক না কেন সে মুকাল্লাফ নয়, তার ওপর দীনের ওয়াজিব দায়িত্বসমূহ যেমন, সালাত, সিয়াম, মিসকীনকে খাওয়ানো ইত্যাদির কোনো ওয়াজিব দায়িত্বই প্রযোজ্য হয় না, অর্থাৎ তার ওপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না।

তৃতীয় শর্ত: সক্ষম অর্থাৎ যে সিয়াম পালনে সক্ষম। আর যে অক্ষম তার ওপর সিয়াম পালন ওয়াজিব নয়, আর এর দলীল আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"আর যে অসুস্থ অথবা ভ্রমণে আছে সে সেই সংখ্যায় অন্য দিনগুলোতে এর কাযা করবে।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

আর অক্ষমতা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত: অস্থায়ী ও স্থায়ী ।

(১) আর অস্থায়ী অক্ষমতা উল্লেখ হয়েছে পূর্বের আয়াতটিতে। যেমন, এমন রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় এবং মুসাফির -এ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য সাওম পালন না করা জায়েয। এরপর তাদের ছুটে যাওয়া সাওম কাযা করা ওয়াজিব।

(২) আর স্থায়ী অক্ষমতা। যেমন, এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না এবং এমন বৃদ্ধ লোক যিনি সিয়াম পালনে অক্ষম, আর তা উল্লিখিত হয়েছে তাঁর বাণীতে:

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: ١٨٤]

"আর যারা সাওম পালনে অক্ষম তারা ফিদয়া দিবে (অর্থাৎ মিসকীন খাওয়াবে)।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

এই আয়াতটিকে ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাফসীর করে বলেছেন:

"বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যাদের অনেক বয়স হয়েছে তারা যদি সাওম পালনে সক্ষম না হয়, তবে তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।"

চতুর্থ শর্ত: সে যেন মুকীম বা অবস্থানকারী হয়। সুতরাং সে যদি মুসাফির হয় তবে তার ওপর সাওম পালন করা ওয়াজিব নয়। এর দলীল হলো তাঁর বাণী:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“আর যে অসুস্থ অথবা ভ্রমণে আছে সে সেই সংখ্যায় অন্য দিনগুলোতে এর কাযা করবে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

আর আলেমগণ এ ব্যাপারে ইজমা‘ (ঐকমত্য) প্রকাশ করেছেন যে, একজন মুসাফিরের জন্য সাওম ভঙ্গ করা জায়েয (বৈধ)। আর একজন মুসাফিরের জন্য উত্তম হলো তার জন্য যেটা বেশি সহজ তা করা। যদি সাওম পালন করায় তার ক্ষতি হয় তবে তার (মুসাফিরের) জন্য সাওম পালন করা হারাম। এর দলীল হলো তাঁর বাণী:

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩﴾ [النساء: ٢٩]

“তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াময়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

এই আয়াতটি থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা তার জন্য নিষিদ্ধ। (দেখুন প্রশ্ন নং ২০১৬৫)।)

যদি আপনি বলেন সেই ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু যা সিয়াম পালনকে হারাম করে?

তবে তার উত্তর হলো: এমন ক্ষতি যা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা সম্ভব অথবা কারো দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে জানা সম্ভব।

(১) আর ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা একজন রোগী নিজেই অনুভব করবে যে সাওম পালন করার কারণে তার ক্ষতি হচ্ছে ও তা তার পীড়ার কারণ হচ্ছে যার কারণে সুস্থতা দেরীতে হয় এ ধরণের কিছু।

(২) আর তথ্যের মাধ্যমে এই ক্ষতি সম্পর্কে জানার অর্থ হলো, একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ডাক্তার তাকে (রোগীকে) এ তথ্য দিবে যে সাওম পালন করা তার জন্য ক্ষতিকর।

পঞ্চম শর্ত: যদি সাওম পালনে বাধাদানকারী বিষয়সমূহ না পাওয়া যায়। আর এটি বিশেষভাবে নারীদের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং হায়েয হয়েছে ও নিফাস হয়েছে এতদুভয়ের ওপর সাওম পালন বাধ্যতামূলক নয়। এর দলীল হলো নবীর স্বীকৃতিমূলক বাণী:

«أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم»

"একজন নারীর মাসিক ঋতুস্রাব হলে সে কি সালাত ও সাওম ত্যাগ করে না?"[28]

সুতরাং আলেমগণের ইজমা' তথা সর্বসম্মত মত অনুসারে তার ওপর সাওম পালন ওয়াজিব হয় না আর তা পালন করলে শুদ্ধও হয় না। তবে তার ওপর এই দিনগুলো কাযা করা ইজমা' সর্বসম্মতিক্রমে বাধ্যতামূলক।[29]

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

[28] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৮।

[29] আশ-শারহুল-মুমতি' (৬/৩৩০)।

সাওম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

ফাতওয়া নং ৩৮০২৩

প্রশ্ন: আশা করি আপনারা সাওম বাতিলকারী বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন।

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা‘আলা সর্বোচ্চ হিকমাহ’র আলোকে শরী‘আতে সাওম পালনের বিধান রেখেছেন।

তিনি সাওম পালনকারীকে এমন মধ্যম পন্থায় সাওম পালন করতে বলেছেন, যাতে সে সিয়াম পালনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আবার এমন কিছুও গ্রহণ না করে যা সিয়ামের বিপরীত।

তাই সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ দু ধরণের:

(এক) কিছু সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় রয়েছে যা শরীর থেকে নির্গত হয় এমন ধরণের যেমন, যৌন মিলন, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, মাসিক ঋতুস্রাব, শিঙ্গা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যা শরীর থেকে বের হয় ও তা শরীরকে দুর্বল করে দেয়। তাই আল্লাহ তা‘আলা এগুলোকে সিয়াম বিনষ্টকারী বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যাতে করে সাওম পালনের দুর্বলতা এসব বস্তু নির্গত হওয়ার কারণে সৃষ্ট দুর্বলতার সাথে যোগ হওয়ার ফলশ্রুতিতে একজন সাওম পালনকারী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; ফলে সাওম তার স্বাভাবিক মধ্যম পন্থার সীমারেখা অতিক্রম করে।

(দুই) কিছু সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় রয়েছে যা (শরীরে) প্রবেশ করে এমন ধরণের যেমন, খাওয়া, পান করা ইত্যাদি। একজন সাওম

পালনকারী যদি কিছু খায় বা পান করে, তবে সিয়াম পালনের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট হিকমাহ অর্জিত হয় না।[30]

আর আল্লাহ তা'আলা মূল সিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহকে একসাথে উল্লেখ করেছেন তাঁর এই বাণীতে:

﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]

"সুতরাং এখন (রমযানের রাতে) তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে মিলন কর, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তার খোঁজ কর, আর খাও ও পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত (যার প্রারম্ভ সূর্য) পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আল্লাহ তা'আলা এই সম্মানিত আয়াতে মূল সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো (১) খাওয়া (২) পান করা ও (৩) যৌন মিলন।

আর সিয়াম বিনষ্টকারী যাবতীয় বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহ'তে ব্যাখ্যা করেছেন।

সিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ সাতটি আর তা হলো:

১. যৌন মিলন

২. ইসতিমনা' (নিজস্ব ক্রিয়া/হস্তমৈথুন)

৩. খাওয়া ও পান করা

---

[30] মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২৫/২৪৮)।

৪. যা খাওয়া ও পান করার অর্থে পড়ে

৫. হিজামাহ বা শিঙ্গা ইত্যাদির মাধ্যমে রক্ত বের করা

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা

৭. একজন নারীর (শরীর) থেকে হায়েয (মাসিক) ও নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তপাত)-এর রক্ত বের হওয়া।

(এক)

সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের প্রথমটি হলো: যৌন মিলন

এটি সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক ও সবচেয়ে গুনাহের যোগ্য।

যে রমযান মাসে দিনের বেলা ইচ্ছাকৃতভাবে যৌন মিলন করে, যাতে করে দুই (পুরুষ ও নারীর) খিতান (খাতনা করা স্থানসমূহ) একত্রিত হয় এবং দুই গুপ্তাঙ্গের যে কোনো একটির হাইমেন লুপ্ত হয় (পড়ে যায়), তবে সে তার সাওম নষ্ট করল, বীর্যপাত ঘটাক বা নাই ঘটাক, এক্ষেত্রে (১) তার তাওবা করতে হবে (২) সেদিনের বাকি অংশ (সাওম রেখে) পূর্ণ করতে হবে (৩) সেদিনের সাওম কাযা করতে হবে (৪) বড় কাফফারা আদায় করতে হবে।

এর প্রমাণ হচ্ছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لا . قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: لا . قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ: لا ...»

“এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ‘আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি হে রাসূলুল্লাহ! তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, ‘আর কিসে আপনাকে ধ্বংস করল? সে ব্যক্তি বললেন, ‘আমি আমার স্ত্রীর সাথে রমযানে (দিনের বেলা যৌন) মিলন করেছি।’ তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, ‘আপনি কি একজন দাস মুক্ত করতে পারেন?’ তিনি (সে ব্যক্তি) বললেন, ‘না’। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, ‘তবে কি আপনি একাধারে দুই মাস সাওম পালন করতে পারেন?’ তিনি (সে ব্যক্তি) বললেন, ‘না’। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, ‘তবে কি আপনার কিছু আছে যা দিয়ে ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারেন?’ তিনি (সে ব্যক্তি) বললেন, ‘না’।........ [31]

যৌন মিলন ছাড়া অন্য কোনো সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হয় না।

(দুই)

সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের দ্বিতীয়টি হলো নিজস্ব ক্রিয়া বা হস্তমৈথুন। আর তা হলো হাত বা ইত্যাদি দিয়ে বীর্য বের করা।

হস্তমৈথুন যে সিয়াম ভঙ্গকারী তার দলীল হচ্ছে, হাদীসে কুদসীতে সাওম পালনকারী সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

«يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»

“যে তার খাবার, পানীয় ও কামনা বাসনা আমার জন্য ত্যাগ করে”।[32]

[31] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১১।

[32] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫১।

আর বীর্য নির্গত করা কামনা বাসনার মাঝে পড়ে যা একজন সাওম পালনকারীকে পরিত্যাগ করতে হবে।

যে রমযান মাসের দিনের বেলা হস্তমৈথুন করে, তার ওপর ওয়াজিব হলো (১) আল্লাহর কাছে তাওবা করা, (২) দিনের বাকি অংশ সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা এবং (৩) সেদিনের সাওমের কাযা করা।

যদি সে হস্তমৈথুন শুরু করে থেমে যায় এবং বীর্যপাত না ঘটায়, তবে তাকে তাওবা করতে হবে, আর তার সাওম শুদ্ধ হবে, বীর্যপাত না ঘটানোর জন্য তাকে সাওম কাযা করতে হবে না। একজন সাওম পালনকারী কামভাব উদ্রেককারী সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা উচিৎ এবং খারাপ চিন্তা-ভাবনা রোধ করা উচিৎ।

আর মাযী এর ক্ষেত্রে শক্তিশালী মতটি হলো এতে সাওম ভঙ্গ হয় না।

(তিন)

সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের তৃতীয়টি হলো খাওয়া ও পান করা, আর তা হলো মুখের মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলীতে পৌঁছানো।

একইভাবে যদি নাক দিয়ে পাকস্থলীতে কোনো কিছু প্রবেশ করানো হয় তবে তা খাওয়া ও পান করারই সমতূল্য।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

“অযুর সময় নাকে পানি গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করাও যদি না তুমি সাওম পালনকারী হও।”[33]

যদি নাকের মাধ্যমে পানি পাকস্থলীতে প্রবেশ করা সাওমের ওপর প্রভাব না ফেলত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকে অযুর সময় গভীরভাবে পানি প্রবেশ করাতে নিষেধ করতেন না।

(চার)

সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের চতুর্থটি হলো, যা খাওয়া ও পান করার অর্থে পড়ে। আর এর মাঝে দু’টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক) সাওম পালনকারীর শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্ত প্রবেশ করানো, যেমন, সে যদি রক্তপাতের শিকার হয় তবে ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্ত প্রবিষ্ট করা হলে তার সাওম ভেঙ্গে যাবে। কারণ, খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা খাবার গ্রহণেল সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে রক্ত তৈরী হওয়া।

খ) খাদ্য ও পানীয়ের স্থলাভিষিক্ত হয় এমন খাবার জাতীয় ইনজেকশন। কারণ, তা খাদ্য ও পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত।[34]

তবে যেসব ইনজেকশন যা খাদ্য ও পানীয়ের বদলে ব্যবহৃত হয় না, তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেমন, পেনসিলিন, ইনসুলিন ইত্যাদি অথবা শরীরকে তৎপর করার জন্য বা ভ্যাকসিনের জন্য

[33] তিরমিযী, হাদীস নং ৭৮৮। আলবানী ‘সহীহ তিরমিযী’ (৬৩১) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

[34] আশ-শাইখ ইবন উসাইমীনের ‘মাজালিস শাহর রমযান’ এ (পৃ. ৭০)

পেশীর মাধ্যমে যে ইনজেকশন দেওয়া হয়, তা সিয়ামের ক্ষতি করে না।[35]

তবে বেশি সাবধানতা হলো এসব রাতের বেলা হওয়া।

আর কিডনী ডায়ালাইসিস, যার জন্য তা পরিষ্কার করতে রক্ত বের করে তা কেমিক্যাল পদার্থ, পুষ্টি দানকারী উপাদান যেমন, চিনি, লবণ ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে আবারো তাতে (কিডনীতে) প্রবেশ করানো হয়, তা সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় বলে গণ্য হবে।[36]

(পাঁচ)

সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের পঞ্চমটি হলো শিঙ্গার মাধ্যমে রক্ত বের করা। এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

“শিঙ্গা প্রদানকারী (যে রক্ত বের করে) এবং শিঙ্গা গ্রহণকারী (যার রক্ত বের করা হয়) উভয়ই সাওম ভঙ্গ করল।”[37]

আর রক্ত দান করা, শিঙ্গার মাধ্যমে রক্ত বের করার অর্থে পড়ে। কারণ, তা শিঙ্গার মতোই শরীরের উপর প্রভাব ফেলে।

আর তাই একজন সাওম পালনকারীর রক্ত দান করা জায়েয নয়; যদি না একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, একান্ত প্রয়োজন হলে তার জন্য

---

[35] ফাতাওয়া মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (৪/১৮৯)।

[36] ফাতাওয়া আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা’ইমাহ (১০/১৯)

[37] আবু দাঊদ, হাদীস নং ২৩৬৭। আল-আলবানী ‘সহীহ আবী দাঊদ’ এ (২০৪৭) একে সহীহ বলেছেন।

রক্ত দান করা জায়েয। এক্ষেত্রে রক্ত দানকারীর সাওম ভঙ্গ হয় এবং তাকে সে দিনের কাযা করতে হবে।[38]

আর যার রক্তপাত হয়েছে, তার সিয়াম শুদ্ধ হবে কারণ সে তা ইচ্ছাকৃতভাবে করে নি।[39]

আর দাঁত তোলা বা ক্ষতস্থান ড্রেসিং বা রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য রক্ত বের হলে তা সাওম ভঙ্গ করে না; কারণ তা হিজামাহ বা শিঙ্গা লাগানো নয়, এর অর্থেও পড়ে না। কারণ তা হিজামাহ বা শিঙ্গা লাগানোর ন্যায় শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে না।

(ছয়)

ষষ্ঠ সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».

“যার অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসে, তাকে কাযা করতে হবে না, আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যাতে কাযা করে।”[40]

আর ইবনল মুনযির বলেছেন, আলেমগণের মাঝে এ ব্যাপারে ইজমা‘ (ঐকমত্য) রয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা সাওম বাতিল করে।’[41]

---

[38] ইবন ‘উসাইমীনের ‘মাজালিস শাহর রমযান’ (পৃ. ৭১)

[39] ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়েমাহ (১০/২৬৪)

[40] তিরমিযী, হাদীস নং ৭২০। আল-আলবানী ‘সহীহ তিরমিযী’ (৫৭৭)-তে একে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[41] আল-মুগনী (৪/৩৬৮)।

সুতরাং যে মুখে আঙ্গুল দিয়ে বা পেট চেপে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো দুর্গন্ধ শুঁকে বা বমি আসে এমন কিছুর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করল, তাকে কাযা করতে হবে।

যদি তার পাকস্থলী ফেঁপে বমি আসে, তবে তার বমি রোধ করা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ, তা তার ক্ষতির কারণ হবে।[42]

(সাত.)

সপ্তম সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হলো হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) ও নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তপাত)–এর রক্ত বের হওয়া। এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ».

"একজন নারীর হায়েয (মাসিক) হলে সে কি সালাত ও সাওম ত্যাগ করে না?"[43]

তাই যখনই কোনো নারী হায়েয বা নিফাসের রক্ত দেখে, তখনই তার সাওম ফাসিদ (বিনষ্ট) হয়ে যায়, তা সূর্যাস্তের এক মুহূর্ত আগেও হোক না কেন।

যদি কোনো নারী হায়েযের রক্ত চলাচল অনুভব করে আর তা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বের না হয়, তবে তার সাওম শুদ্ধ হবে এবং তার সেদিনের জন্য যথেষ্ট হবে।

একজন হায়েয ওয়ালী বা নিফাস ওয়ালী নারীর যদি রাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও সে সিয়াম পালনের নিয়্যাত করে এবং তার গোসল করার

---

[42] ইবন 'উসাইমীনের 'মাজালিস শাহর রমযান' (পৃ. ৭১)।

[43] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪।

আগেই সূর্য উদিত হয়, তবে সকল ‘আলেম’ এর মতেই তার সে সাওম শুদ্ধ হবে।[44]

একজন হায়েয ওয়ালী নারীর জন্য উত্তম হলো তার স্বভাবজাত প্রকৃতির ওপর থাকা, আল্লাহ তার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা, রক্ত বন্ধ করে এমন কিছু গ্রহণ না করা এবং হায়েয তথা হায়েযের সময় সাওম ভঙ্গ করা ও পরে তা কাযা করার যে বিধান আল্লাহ তার জন্য প্রদান করেছেন, তা গ্রহণ করা। এমনই ছিলেন উম্মুল মুমিনীনগণ, পরবর্তী সাহাবী ও তাবে‘ঈগণের নারীরা।[45] এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে রক্তপাত রোধকারী উপাদানসমূহের বহুমুখী ক্ষতি প্রমাণিত হয়েছে এবং অসংখ্য নারী এর ফলশ্রুতিতে অনিয়মিত হায়েয হওয়া জনিত বিপদের শিকার হয়েছে। তবে কোনো নারী যদি তা করে ও এমন কিছু গ্রহণ করে যা তার রক্তপাত বন্ধ করে এবং পবিত্র অবস্থায় সাওম পালন করে, তবে তার সেদিনের সাওম যথেষ্ট (শুদ্ধ) হবে।

এগুলো হলো সাওম ফাসিদকারী বিষয়সমূহ। এগুলোর কারণে হায়েয ও নিফাস ব্যতীত একজন সাওম পালনকারীর সাওম ভঙ্গ হয় না যদি না তার মাঝে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়:

(১) সে যদি এ ব্যাপারে জেনে থাকে অর্থাৎ অজ্ঞ না হয়।

(২) তার যদি এ ব্যাপারে স্মরণ থাকে অর্থাৎ ভুলে না যায়।

---

44 আল-ফাতহ (৪/১৪৮)।

45 ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ (১০/১৫১)।

(৩) সে যদি এ ব্যাপার ইচ্ছাকৃতভাবে করে অর্থাৎ বাধ্য হয়ে না করে।

আর আমাদের আরও জানা উচিৎ কিছু বিষয় যা সাওম ভঙ্গ করে না:

১। এনেমাস, চোখের ড্রপ, কানের ড্রপ, দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা এসব সাওম ভঙ্গ করে না।[46]

২। এজমা (শ্বাসকষ্ট) চিকিৎসায় যে ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট বা এ জাতীয় বস্তু জিভের নিচে রাখা হয় তা সাওম ভঙ্গ করে না; যদি না গিলে ফেলা হয়।

৩। ভ্যাজাইনাতে সাপোসিটরী, লোশন, দুরবিক্ষণ যন্ত্র, ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য যে আঙ্গুল প্রবেশ করানো হয়, তা সাওম ভঙ্গ করে না।

৪। মাতৃগর্ভে স্পেকুলাম ইত্যাদি প্রবেশ করানো বা আই.ইউ.ডি (I.U.D) সাওম ভঙ্গ করে না।

৫। পুরুষ ও নারীর ইউরিনারী ট্র্যাক্টে যে ক্যাথেটার, স্কোপ বা অপাকিউ ডাই প্রবেশ করানো হয়, এক্স-রে এর জন্য এবং ব্লাডার ধৌতকরণে যে ঔষধ বা মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, তা সাওম ভঙ্গ করে না।

৬। দাঁত ফিলিং, উঠানো, পরিষ্কার করা বা মিসওয়াক, টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা সাওম ভঙ্গ করে না যদি না গলায় পৌঁছে এমন কিছু গিলে ফেলা হয়।

৭। কুলি করা, গরগরা করা, চিকিৎসার্থে মুখ দিয়ে স্প্রে গ্রহণ সাওম ভঙ্গ করে না, যদি না গলায় পৌঁছে এমন কিছু গিলে ফেলা হয়।

---

[46] মাজমূ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম (২৫/২৩৩), (২৫/২৪৫)।

৮। অক্সিজেন বা এনেসথেসিয়ার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস সাওম ভঙ্গ করে না যদি না রোগীকে পুষ্টি দানকারী তরল দেওয়া হয়।

৯। ক্রিম, মলম বা চিকিৎসার্থে চামড়ায় ব্যবহৃত প্লাস্টার যাতে ওষুধ বা কেমিক্যাল পদার্থ থাকে ইত্যাদির কোনো কিছু শরীরের চামড়ার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো হলে, তা সাওম ভঙ্গ করে না।

১০। শিরায়, হার্টের কোনো অংশে বা অন্য কোনো অঙ্গে চিকিৎসার্থে ডায়গোনোস্টিক ছবি নেওয়ার জন্য ক্যাথেটার (চিকন টিউব) প্রবেশ করানো হলে, তা সাওম ভঙ্গ করে না।

১১। পেটের প্রাচীর দিয়ে ইনটেসটাইন পরীক্ষার বা সার্জিকাল অপারেশন পরিচালনার জন্য স্কোপ প্রবেশ করানো হলে তা সাওম ভঙ্গ করে না।

১২। লিভারের বা অন্য কোনো অঙ্গের বায়োপসি করা যদি কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত তরলের সাথে না হয়, তবে তা সাওম ভঙ্গ করে না।

১৩। এন্ডোসকপি করা হলে এর সাথে যদি কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত তরল প্রবেশ করানো না হয়, তবে তা সাওম ভঙ্গ করে না।

১৪। ব্রেইন বা স্পাইনাল কার্ড এ কোনো ইন্সট্রুমেন্ট বা ওষুধ জাতীয় পদার্থ প্রবেশ করানো হয়, তবে তা সাওম ভঙ্গ করে না।

দেখুন, শাইখ ইবন উসাইমীনের **‘মাজালিস শাহর রমযান’** ও এই ওয়েবসাইটের (www.islam-qa.com) বই পত্র বিভাগের **‘সিয়াম সংক্রান্ত ৭০টি মাস‘আলা’** শিরোনামের বুকলেটটি।

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

কখন একজন ব্যক্তি সাওম পালনের নিয়্যাত করবে আর দিনের বেলায় রমযান শুরু হয়ে গেছে জানলে সে কী করবে?

ফাতওয়া নং ২৬৮৬৩

প্রশ্ন: রমযানে সাওম রাখার নিয়্যাত কী রাতে করা ওয়াজিব নাকি দিনে? আর কেউ যদি পূর্বাহ্নে এসে বলে যে আজকে রমযান, তাহলে তাকে তার কাযা করতে হবে কি না?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রমযান মাসের সাওমের নিয়্যাত রাতে ফজরের আগে করাটা ওয়াজিব। আর ঐদিন নিয়্যাত ছাড়া দিনের বেলা সাওম রাখাটা শুদ্ধ হবে না। কেউ যদি পূর্বাহ্নে এসে জানতে পারে যে আজকে রমযান তাহলে সে রোযার নিয়্যাত করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে তাকে কাযা করতে হবে। কারণ, ইবন উমার, হাফসাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»

“যে ফজরের আগে সিয়ামের নিয়্যাত বাঁধে না, তার কোনো সিয়াম নেই।”[47]

এটি ফরয সাওমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নাফল সাওমের ক্ষেত্রে দিনের বেলায় নিয়্যাত করার অনুমতি আছে। যদি আপনি ফজরের পরে

[47] ইমাম আহমাদ, আস-সুনানের সংকলকগণ, ইবন খুযাইমাহ এবং ইবন হিব্বান বর্ণনা করেছেন এবং শেষের দু’জন এই হাদীসটিকে সহীহ এবং মারফূ‘ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

খাওয়া বা পান করা বা যৌন মিলন থেকে বিরত থাকেন। কারণ, ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর নিকট পূর্বাহ্ণে এসে বললেন, «هل عندكم شيء؟» “তোমাদের কাছে কিছু (খাবার) আছে কি?” ‘আয়েশা বললেন, “না।” তিনি বললেন, «إني إذاً صائم» “তাহলে আমি সাওম পালন করলাম।”[48]

আর আল্লাহই তাওফীক দাতা। আর আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

গবেষণা ও ফাতওয়া ইস্যুকারী আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ (১০/২৪৪)

ইসলাম কিউ.এ

[48] এটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

কীভাবে একজন নারী সালাত আদায়ের জন্য তার মাসিকের শেষ সময় নির্ধারণ করবে

ফাতওয়া নং ৫৫৯৫

প্রশ্ন: একজন নারী তার মাসিক শেষ হওয়ার পর কখন সালাত আদায় করবে, তা কীভাবে সময় নির্ধারণ করবে? একজন নারী তার মাসিকের শেষ সময় শেষ হয়েছে ভেবে সালাত আদায় করল, কিন্তু তারপর তার আবার রক্ত নির্গমন বা বাদামী রঙের স্রাব দেখা গেল, তখন তার কী করা ওয়াজিব?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ জন্য।

প্রথমত: যখন কোনো নারীর মাসিক হয় তখন তা থেকে তার পবিত্রতার চিহ্ন হলো রক্ত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া তা কম বা বেশি সময়ের জন্য হোক না কেন। ফকীহগণের অনেকের মতে, মাসিকের সর্বনিম্ন সময় এক দিন এক রাত এবং সর্বোচ্চ সময় ১৫ দিন।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ.-এর মতে, মাসিকের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, বরং যতক্ষণ তার মধ্যে মাসিকের (রক্তের) বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকবে, তখনই সেটা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বলেছেন, “হায়েয, আল্লাহর সাথে কুরআন ও সুন্নাহ এ অনেক রকম বিধি-বিধান সম্পৃক্ত করেছেন, আর এর কোনো সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট করে দেন নি, দুই হায়েযের মাঝখানে পবিত্রতার সময়টিও নির্ধারণ করে দেন নি। কারণ, এতে করে মানুষের জন্য শরী‘আতের বিধান পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে...”

এরপর তিনি বলেছেন, “আর ‘আলেমগণের মাঝে অনেকে এর (মাসিকের) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ করেছেন। এরপর সেই নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আবার তাদের মধ্যে অনেকে সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ করলেও সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ করেন নি। তবে এখানে তৃতীয় মতটি বেশি সঠিক, আর তা হলো: এর (মাসিকের) সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই।”[49]

দ্বিতীয়ত: এছাড়া আরও এক ধরণের রক্ত আছে যাকে ইসতিহাযা বলে, যা হায়েযের রক্ত থেকে আলাদা। এর বিধি-বিধান হায়েযের বিধি-বিধান থেকে আলাদা। আর এই রক্তকে হায়েযের রক্ত থেকে নিচের কয়েকটি গুণাবলী দ্বারা পৃথক করা যায়:

রং- হায়েযের রক্ত কালচে আর ইসতিহাযার রক্ত লাল।

ঘনত্ব- হায়েযের রক্ত ঘন, গাঢ় আর ইসতিহাযার রক্ত পাতলা।

ঘ্রাণ - হায়েযের রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত আর ইসতিহাযার রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত নয়। কারণ, এটি শিরার স্বাভাবিক রক্ত।

জমাটবদ্ধতা- হায়েযের রক্ত বের হওয়ার পর জমাট বাঁধে না, কিন্তু ইসতিহাযা’র রক্ত জমাট বাঁধে। কারণ, তা শিরার রক্ত।

হায়েযের কারণে সালাত নিষিদ্ধ হয় আর ইসতিহাযার কারণে সালাত নিষিদ্ধ হয় না; বরং সে নারী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রতি সালাতের জন্য অযু করবে যদি পরবর্তী ওয়াক্তের সালাত পর্যন্ত রক্ত

[49] মাজমূ‘উল ফাতাওয়া (১৯/২৩৭)

পড়া অব্যাহত থাকে, এমনকি সালাত আদায়ের সময়েও যদি এ রক্ত পড়তে থাকে তবে তাতে সালাতের কোনো সমস্যা হবে না।

মূলনীতিটি হলো, নির্গত হওয়া রক্ত হায়েযের (মাসিকের) রক্ত হিসেবেই ধর্তব্য হবে, যদি না তা প্রবাহমান হয় এবং গোটা মাস জুড়ে অব্যাহত থাকে, (তখন তা ইস্তেহাযার রক্ত বিবেচিত হবে) এ হচ্ছে শাইখুল ইসলামের মত অথবা হায়েযের (মাসিকের) সর্বোচ্চ সময়সীমা ১৫ দিনের বেশি অতিক্রান্ত হলে তবে অধিকাংশ 'আলেমের মতে তা ইসতিহাযা-এর রক্ত বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয়ত: একজন নারী তার পবিত্রতা দু'টো চিহ্নের যে কোনো একটির মাধ্যমে জানতে পারে:

(১) শ্বেতস্রাব: আর তা হলো একধরনের সাদা তরল পদার্থ যা জরায়ু থেকে বের হয়। এটি পবিত্রতার একটি চিহ্ন।

(২) পূর্ণ শুষ্কতা: যদি কোনো নারীর এই শ্বেতস্রাব না আসে, সেক্ষেত্রে সে রক্ত বের হওয়ার স্থানে সাদা তুলো প্রবেশ করাবে, তা যদি পরিষ্কার অবস্থায় বের হয় তবে সে জানবে যে সে পবিত্র হয়ে গেছে, এরপর সে গোসল করে সালাত আদায় করবে।

আর যদি সে তুলো লাল, হলুদ ও খয়েরী রঙ এর বের হয় তাহলে সে সালাত আদায় করবে না।

আর মহিলা সাহাবীগণ, 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে পাত্রে করে তুলো পাঠাতেন যাতে হলোদে রঙ (এর স্রাব) থাকতো। তিনি

(আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলতেন: "আপনারা শ্বেতস্রাব না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।"[50]

তবে যদি এই হলোদে বা খয়েরী রঙের স্রাব সে নারীর পবিত্রতার দিনগুলোতে (শ্বেতস্রাব বের হওয়ার পর) আসে, তা ধর্তব্য হবে না এবং সে নারী তার সালাত ত্যাগ করবে না, গোসলও করবে না (তবে তা পরিষ্কার করে অযু করবে) কারণ তা গোসল ওয়াজিব করে না, আর তা থেকে অপবিত্রও হয় না।

এর দলীল হলো উম্মু 'আত্বিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস:

«كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً».

"আমরা পবিত্রতার পর হলোদে বা খয়েরী স্রাবকে কোনো কিছু হিসেবে (হায়েয হিসেবে) গণ্য করতাম না।"[51] তবে "পবিত্রতার পর" কথাটি উল্লেখ করেন নি]

'কুদরাহ' বা খয়েরী স্রাব ময়লা পানির ন্যায়। 'কোনো কিছু হিসেবে (হায়েয হিসেবে) গণ্য করতাম না' অর্থাৎ হায়েয হিসেবে গণ্য করতাম না, তবে এতে অযু করা ওয়াজিব হয়।

তবে যদি খয়েরী বা হলুদ স্রাব হায়েযের সাথে বের হয় তবে তা হায়েযের মধ্যে বলে গণ্য হবে।

---

[50] এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী মু'আল্লাক হিসেবে, (কিতাব আল-হায়েয, বাব ইক্ববাল আল-মাহীদ্ব ওয়া ইদবারিহ) ও মালিক (১৩০)

[51] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০৭; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২০

চতুর্থত: যদি কোনো নারী মনে করে যে সে পবিত্র হয়েছে এবং এরপর রক্ত ফিরে আসে এবং সেই রক্ত হায়েযের বৈশিষ্ট্য বহন করে তবে তা হায়েয (মাসিক)। যদি না গোটা মাস জুড়ে অব্যাহত থাকে।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

একজন নারী তার মাসিকের পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে সাওম পালন করেছে

ফাতওয়া নং ১০৬৪৫২

প্রশ্ন: একজন নারী তার মাসিকের শেষ সময় সন্দেহ নিয়ে সাওম পালন করেছিল। পরের দিন সকালে দেখল যে সে পবিত্র হয়েছে। যেদিন সে তার পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে রোযা রেখেছিল সে ব্যাপারে শরী'আততে বিধান কী?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"তার সাওমটি হয় নি এবং তাকে তার কাযা করতে হবে। কারণ, মূল নীতিটি হচ্ছে তার মাসিক চলছিল, তার পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে রোযা শুরু করার অর্থ হলো সন্দেহের সাথে ইবাদাত শুরু করা। আর নিশ্চিত হয়ে কোনো ইবাদাত শুরু করা হলো সেই ইবাদাত শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত, এই কারণেই তার সাওমটি হয় নি।" উদ্ধৃতির সমাপ্তি।

ফাযীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীন।

মাজমূ' ফাতাওয়া ইবন 'উসাইমীন', ফাতাওয়া আস-সিয়াম (১০৭, ১০৮)

ইসলাম কিউ.এ

জনৈক নারী তার হায়েয থেকে পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে যদি সালাত আদায় করেছে ও সাওম পালন করেছে

ফাতওয়া নং ৬৬০৬২

প্রশ্ন: আমি রাতের সাহূর (সেহরী)-এর সময় গোসল করেছি। কারণ, আমি জানি যে আমার মাসিক এই দিনে শেষ হবে, এরপর আমি সেহরী খেয়েছি, সাওম পালন করেছি ও সালাত ও আদায় করেছি; কিন্তু আমার এরপর ফজর থেকে মাগরিবের আযান পর্যন্ত সময়ে কোনো কিছু বের হয়নি। এরপর আমি যখন সালাত আদায়ের জন্য গেলাম, দেখতে পেলাম যে, আমার মাসিক আসলেই শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার সিয়াম ও সালাত কি সঠিক হয়েছে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

একজন হায়েয ওয়ালী বা ঋতুবতী নারীর মাসিক শেষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার আগে হায়েয থেকে গোসল করা, সালাত আদায় করা ও সিয়াম পালন করায় তাড়াহুড়ো করা জায়েয (বৈধ) নয়।

আর একজন নারী তার হায়েয শেষ হওয়ার ব্যাপারটি জানতে পারে সাদা স্রাব বের হওয়ার মাধ্যমে যা তাদের (নারী সমাজে) পরিচিত, আর তা হলো, শ্বেতস্রাব। আর নারীদের কেউ কেউ তার পবিত্রতা রক্তের পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জানতে পারে।

সুতরাং একজন নারীর উচিৎ পবিত্রতার ব্যাপারে (পুরোপুরি) নিশ্চিত না হয়ে গোসল করবে না করা।

ইমাম বুখারী ‘ইক্ববাল আল-মাহীদ্ব ওয়া ইদবারিহ’ অধ্যায়ে বলেছেন: ‘আর মহিলা সাহাবীগণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে পাত্রে করে তুলো পাঠাতেন যাতে হলদে রঙ থাকতো। তিনি বলতেন: ‘আপনারা শ্বেতস্রাব না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।’ তিনি এর দ্বারা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া বোঝাতেন। যায়িদ ইবন সাবিতের কন্যার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, নারীরা গভীর রাতে আলোকবাতির সাহায্যে পবিত্রতা এসেছে কিনা তা দেখতেন। তিনি ‘নারীরা এরূপ করত না’ বলে তাদের সমালোচনা করেন।” সমাপ্ত

হাফিয ইবন হাজার রহ. বলেছেন: আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, হায়েযের শুরু বোঝা যায় তা হওয়ার সময় রক্ত পড়ার মাধ্যমে এবং তারা তা শেষ হওয়ার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন’।

কেউ বলেছেন, তা জানা যায় শুষ্কতার মাধ্যমে, আর তা হলো সেখানে কোনো কিছু প্রবেশ করালে তা যদি শুষ্ক অবস্থায় বের হয়।

আবার কেউ বলেন তা জানা যাবে শ্বেতস্রাব এর মাধ্যমে। আর এই মতটি লেখক অর্থাৎ ইমাম বুখারী প্রাধান্য দিয়েছেন।”

আর এতে আছে, শ্বেতস্রাব হায়েয শেষ হওয়ার চিহ্ন। আর এ দ্বারা পবিত্রতা শুরু হয়েছে তা বোঝা যায়। আর তিনি তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন যাদের মতে এটি (পবিত্রতা) শুষ্কতার মাধ্যমে বোঝা যায়। কারণ, হায়েযের মাঝেও (ভেতরে প্রবেশ করানো) তুলো শুষ্ক অবস্থায় বের হতে পারে, সে ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে হায়েয শেষ হওয়ার

ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যা শ্বেতস্রাব এর বিপরীত। আর তা এক ধরণের সাদা তরল যা জরায়ু হায়েযের শেষে বের করে দেয়।

ইমাম মালিক বলেছেন: "আমি নারীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি, এটি তাদের মধ্যে পরিচিত একটি ব্যাপার যা তারা পবিত্রতার সময় দেখা যায়।"[52] সমাপ্ত।

শাইখ ইবন উসাইমীন রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঋতুবতী নারী যদি ফজরের আগে পবিত্র হয় ও পরে গোসল করে তবে তার হুকুম কী?

তিনি এর উত্তরে বলেন: "তার সাওম সঠিক হয়েছে যদি সে ফজর উদিত হওয়ার (অর্থাৎ ফজরের সময় শুরু হওয়ার) আগে পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। মূলনীতিটি হলো, একজন নারীকে সে যে পবিত্র হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে কারণ, নারীদের কেউ কেউ মনে করে যে সে পবিত্র হয়েছে, কিন্তু আসলে সে পবিত্র হয় নি। এ কারণে মহিলা সাহাবীগণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে তুলো নিয়ে আসতেন এবং পবিত্রতার চিহ্ন এসেছে কিনা তা জানতে তাকে তা দেখাতেন, তিনি ('আয়েশা) তাদেরকে বলতেন: "আপনারা শ্বেতস্রাব না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।"

তাই একজন নারীর উচিৎ ধীরস্থিরভাবে নিশ্চিত হওয়া যে সে পবিত্র হয়েছে কি না। সে পবিত্র হলে সাওম পালনের নিয়্যাত করবে যদিও বা সে ফজর উদিত হওয়ার (অর্থাৎ ফজরের সময় শুরু হওয়া) পরে গোসল করে, তবে তার উচিৎ সালাতের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং

---

[52] ফাতহুল বারী, (১/৪২০)

সময় মত ফজরের সালাত পড়ার জন্য তাড়াতাড়ি গোসল করে নেওয়া...”[53]

আর প্রশ্নকারিণী এমন সময়ে গোসল করেছেন যখন তিনি হায়েয শেষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন নি, আর তিনি হায়েয থেকে তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে দেরীতে জানতে পেরেছেন, আর তা ছিল যা তার বক্তব্য অনুসারে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে।

সে কারণে প্রশ্নকারিণী যা করেছেন তা সঠিক হয় নি এবং তার সে দিনের সাওম শুদ্ধ হয় নি। তাই তাকে সেই দিনের কাযা করতে হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর (প্রশ্নকারিনীর জন্য) উপকারী জ্ঞান ও ভালো কাজের তাওফীক চাই।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

[53] মাজমূ‘ ফাতওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৭/প্রশ্ন নং ৫৩)

জনৈক লোক রমযানে দিনের বেলায় বীর্য নির্গত না করে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করল

ফাতওয়া নং ২২৯৩৮

প্রশ্ন: একজন লোক রমযানে দিনের বেলায় বীর্যপাত ছাড়া স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করল। এর হুকুম কী? আর সে স্ত্রীর কী করণীয় যদি সে এ ব্যাপারে না জেনে থাকে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রমযান মাসে দিনের বেলায় যে যৌন মিলন করে সে মুকিম তথা অবস্থানকারী সাওম পালনকারী হলে তার ওপর বড় কাফফারা (আল কাফফারাতুল মুগাল্লাযাহ) ওয়াজিব হয়, আর তা হলো একজন দাস মুক্ত করা, যদি তা না পায় তাহলে দুই মাস পরপর একাধারে সিয়াম পালন করা, আর যদি তাও না পারে তবে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো।

একজন নারীর ব্যাপারেও তা ওয়াজিব হয় যদি সে রাজী থাকে। আর যদি সে এ ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য হয়, তাহলে তার ওপর কিছু ওয়াজিব হয় না।

আর তারা যদি উভয়েই মুসাফির হয়, তবে তাদের কোনো গুনাহ হয় না, তাদের ওপর কোনো কাফফারাও ওয়াজিব হয় না এবং দিনের বাকি অংশ তাদের পানাহার এবং যৌন মিলন থেকে বিরত থাকতে হবে না; বরং তাদের উভয়কেই ঐদিনের সাওম কাযা করতে হবে। তাদের উভয়ের জন্য এক্ষেত্রে (মুসাফির অবস্থায়) সাওম পালন করা বাধ্যতামূলক নয়।

একইভাবে যে ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে সাওম ভঙ্গ করেছে যেমন, শরী‘আত সম্মতভাবে যার জানমাল নিরাপদ এমন কাউকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, এমন ব্যক্তি যদি সেই দিন যৌন মিলন করে, যেই দিনে প্রয়োজন বশতঃ সাওম ভঙ্গ করেছিল, তবে তার ওপর কিছু ওয়াজিব হয় না। কারণ, এক্ষেত্রে সে কোনো ওয়াজিব সাওম ভঙ্গ করে নি।

মুকিম তথা অবস্থানকারী সাওম পালনকারী যদি যৌন মিলন করে, যার ওপর সাওম বাধ্যতামূলক, তার ওপর পাঁচটি জিনিস বর্তায়:

১। পাপ

২। সেই দিনের সাওম ফাসিদ (বিনষ্ট) হওয়া

৩। সেই দিনের বাকি অংশ পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা।

৪। সেই দিনের কাযা ওয়াজিব হওয়া।

৫। (বড়) কাফফারা আদায় ওয়াজিব হওয়া।

আর কাফফারা আদায় করার দলীল হলো সেই হাদীসটি যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করেছিলেন। আর এই ব্যক্তি একাধারে দুই মাস সাওম পালন করতে বা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে অক্ষম ছিলেন, এক্ষেত্রে তার কাফফারা ওয়াজিব হয় নি। কারণ, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা দেন না [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৬] আর অপারগতার ক্ষেত্রে কোনো ওয়াজিব নেই।

আর মুকিম (অবস্থানকারী) কোনো সাওম পালনকারী যদি রমযান মাসের দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে (বীর্য নির্গত করুক বা নাই করুক) তার ওপর বড় কাফফারা ওয়াজিব হয়।

তবে যৌন মিলন ছাড়া বীর্য নির্গত করার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এক্ষেত্রে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে না, বরং তার গুনাহ হবে, তাকে (দিনের বাকি অংশ) যৌনমিলন ও পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কাযা করতে হবে।[54]

[54] আল-ফাতাওয়া আল-জামি'আ লিল-মারআহ আল-মুসলিমাহ (খণ্ড-১, পৃ. ৩৪৮)।

কী ধরনের রোগ একজন সাওম পালনকারীর জন্য সাওম ভঙ্গ বৈধ করে?

ফাতওয়া নং ১২৪৮৮

প্রশ্ন: কোন ধরনের রোগ রমযান মাসে একজন মানুষের জন্য সাওম ভঙ্গ বৈধ করে? যে কোনো রোগে, যদি তা অল্পও হয়, তবে কী সাওম ভঙ্গ করা জায়েয (বৈধ)?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আলেমগণের অধিকাংশের মতে, **যাদের** মধ্যে রয়েছেন চার জন ইমাম (আবু হানিফা, মালিক, শাফে‘ঈ ও আহমাদ), একজন রোগীর জন্য রমযান মাসে সাওম ভঙ্গ করা জায়েয নয় যদি না তার রোগ তীব্র হয়।

আর তীব্র রোগের অর্থ হলো:

১. সাওমের কারণে যদি রোগ বেড়ে যায়।

২. সাওমের কারণে যদি আরোগ্য লাভে দেরি হয়।

৩. সাওমের কারণে যদি খুব বেশি কষ্ট হয় যদিও বা তার রোগ বেড়ে না যায় বা সুস্থতায় বিলম্ব না হয়।

৪. এর সাথে আলেমগণ আরও যোগ করেছেন এমন ব্যক্তিকে যার সিয়াম পালনের কারণে অসুস্থ বা রোগ হবার আশংকা আছে।

ইবনু কুদামাহ রহ. বলেছেন, ‘যে রোগ সাওম ভঙ্গ করা বৈধ করে তা হলো অত্যধিক রোগ যা সাওম পালনের কারণে বেড়ে যায় বা সে রোগ থেকে সুস্থতা লাভে দেরি হওয়ার আশংকা রয়েছে।’[55]

---

[55] আল-মুগনী (৪/৪০৩)।

ইমাম আহমাদকে বলা হলো, “একজন রোগী কখন সাওম ভঙ্গ করতে পারে?”

তিনি বললেন, “যদি সে (সাওম পালন করতে) না পারে।”

তাঁকে বলা হলো: “যেমন জ্বর?”

তিনি বললেন, “কোন রোগ জ্বর থেকে কঠিনতর!...”

আর সঠিক মতটি হলো, যার সিয়ামের কারণে রোগের আশংকা আছে। যেমন, যে রোগী (তার রোগ) বেড়ে যাওয়ার ভয় করে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ। কারণ, সে রোগীর জন্যই সাওম ভঙ্গ করা বৈধ করা হয়েছে যার সিয়ামের কারণে নতুন করে রোগ হওয়ার, যেমন তা বেড়ে যাওয়ার বা বেশি সময় স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই নতুন করে রোগ হওয়া এর অর্থেই পড়ে।” (উদ্ধৃতির সমাপ্তি)

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী বলেছেন, “সাওম পালনে অক্ষম রোগী যার রোগের সুস্থতা আশা করা হয়, তার জন্য সাওম পালন বাধ্যতামূলক নয়....এই হুক্ুম প্রযোজ্য যদি সাওমের কারণে কষ্ট হয় আর এক্ষেত্রে এটি শর্ত নয় যে, তাকে এমন অবস্থায় পৌছাতে হবে যখন একেবারেই সাওম পালন সম্ভব নয়, বরং আমাদের অনেকে বলেছেন, “সাওম ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে শর্ত হলো সাওমের কারণে এমন কষ্ট হওয়া যা সহ্য করা কষ্টসাধ্য।”[56] (উদ্ধৃতির সমাপ্তি)

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, যে কোনো রোগীর জন্যই সাওম ভঙ্গ করা জায়েয, যদি সাওমের কারণে কষ্ট নাও হয়, আর

[56] ‘আল-মাজমূ’ (৬/২৬১)।

এটি একটি বিরল মত। তাই অধিকাংশ আলেমই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী বলেছেন: **“**হালকা রোগ যার কারণে বিশেষ কষ্ট হয় না, তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা জায়েয নয়, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।**”**[57]

শাইখ ইবন উসাইমীন বলেছেন, “যে রোগী সাওম পালনের কারণে প্রভাবিত (ক্ষতিগ্রস্ত) হয় না, যেমন-হালকা সর্দি, হালকা মাথা ব্যথা, দাঁতে ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাওম ভঙ্গ করা হালাল নয়, যদিও আলেমগণের কেউ কেউ বলেছেন তা তার জন্য হালাল এই আয়াতের ভিত্তিতে:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“আর যে কেউ অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নিবে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

তবে আমরা বলব, এই হুকুমটি একটি কারণের সাথে সম্পৃক্ত আর তা হলো, যাতে সাওম ভঙ্গ করা রোগীর জন্য বেশি আরামদায়ক হয়। যদি সে রোগী সাওমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তবে তার জন্য সাওম ভঙ্গ জায়েয নয় এবং তার ওপর সাওম পালন করা ওয়াজিব।**”**[58]

ইসলাম কিউ.এ

[57] আল-মাজমূ‘ (৬/২৬১)।

[58] আশ-শারহ আল-মুমতি‘ (৬/৩৫২)।

কেউ যদি তার যিম্মায় থাকা (ছুটে যাওয়া) সালাতের ও ফরয সাওমের সংখ্যা মনে করতে না পারে, তবে সে কী করবে?

ফাতওয়া নং ৭২২১৬

প্রশ্ন: যদি কোনো মুসলিমের ছুটে যাওয়া সালাত ও সিয়ামের সংখ্যা মনে না থাকে, তবে সে কীভাবে তার কাযা করবে?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত: ছুটে যাওয়া সালাতের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে। যেমন,

প্রথম অবস্থা: ঘুম বা ভুলে যাওয়ার কারণে সালাত ছুটে যাওয়া। এ অবস্থায় তার ওপর কাযা করা ওয়াজিব। এর দলীল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

"যে সালাত আদায় করতে ভুলে যায় বা সে সময় ঘুমিয়ে থাকায় তা ছুটে যায়, তার কাফফারা হলো সে যখনই তা মনে করবে তখনই (সাথে সাথে) সালাত আদায় করে নিবে।"[59]

এবং সে তা ধারাবাহিকভাবে আদায় করবে যেমনটি তার ওপর ফরয হয়েছে, প্রথমটি প্রথমে করবে। এর দলীল জাবির ইবন আবদুল্লাহ-এর হাদীস:

«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت

---

[59] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮৪। শব্দ চয়ন সহীহ মুসলিমের।

الشـــمس تغــرب، قــال النبي صلى الله عليه وســلم: والله ما صــليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب».

"উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খানদাকের যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর এসে কুরাইশ কাফিরদের গালি দিতে লাগলেন, তিনি বললেন: "হে রাসূলুল্লাহ, আমি আসরের সালাত আদায় করতে যেতে যেতে সূর্য ডুবে যেতে লাগল!" নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমিও এর (আসরের) সালাত আদায় করি নি।' এরপর আমরা বাত্বহান-এ দাঁড়ালাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য অযু করলেন, আমরাও সালাতের জন্য অযু করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিব এর সালাত আদায় করলেন।"[60]

দ্বিতীয় অবস্থা: এমন ওযরের কারণে সালাত ছুটে যাওয়া, যে সময় কোনো হুঁশ থাকে না। যেমন, কোমা। এ অবস্থার ক্ষেত্রে তার ওপর থেকে সালাত (আদায়ের দায়িত্ব) উঠে যায় এবং তার ওপর তা কাযা করা ওয়াজিব হয় না।

ফাতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমার এক গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ফলে তিন মাস হাসপাতালে শুয়ে ছিলাম, এ সময়ে আমার কোনো হুঁশ ছিল না। এ পুরো সময়

[60] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩১।

আমি কোনো সালাত আদায় করি নি। আমার ওপর থেকে কি তা (সালাত আদায়ের দায়িত্ব) উঠে যাবে নাকি পূর্বের সব (ছুটে যাওয়া) সালাত পুনরায় আদায় করব?

তারা উত্তরে বললেন:

“উল্লিখিত সময়ের সালাত (কাযা আদায়ের দায়িত্ব) আপনার থেকে ছুটে যাবে। কারণ, আপনার তখন কোনো হুঁশ ছিল না।”

তাদেরকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যদি কেউ এক মাস অজ্ঞান অবস্থায় থাকে আর এ পুরো মাস কোনো সালাত আদায় না করে, তবে সে কীভাবে ছুটে যাওয়া সালাত পুনরায় আদায় করবে?

তারা উত্তরে বলেন:

“এ সময়ে যে সালাতসমূহ বাদ গিয়েছে তা কাযা করবে না। কারণ, সে উল্লিখিত অবস্থায় পাগলের হুকুমের মধ্যে পড়ে। আর পাগল ব্যক্তির জন্য কলম উঠানো হয়েছে (অর্থাৎ তার ওপর শরী‘আতের বিধি-বিধান প্রযোজ্য নয়)।”[61]

তৃতীয় অবস্থা: ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওযর (অজুহাত) ছাড়া সালাত ত্যাগ করা, আর তা কেবল দুই ক্ষেত্রেই হতে পারে:

এক. সে যদি সালাতকে অস্বীকার করে, এর ফরয হওয়াকে মেনে না নেয়, তবে সে লোকের কুফুরীর ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ, সে ইসলামের ভিতরে নেই। তাকে (আগে) ইসলামে প্রবেশ করতে হবে, এরপর এর আরকান ও ওয়াজিবসমূহ পালন করতে হবে। আর

[61] ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ (৬/২১)।

কাফির থাকা অবস্থায় যে সালাত ত্যাগ করেছে তার কাযা করা তার ওপর ওয়াজিব নয়।

দুই. সে যদি অবহেলা বা অলসতাবশত সালাত ত্যাগ করে, তবে তার কাযা শুদ্ধ হবে না। কারণ সে যখন তা ত্যাগ করেছিল, তখন তার কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর (অজুহাত) ছিল না। আর আল্লাহ সালাতকে সুনির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট এক সময়ে ফরয করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء: ١٠٣]

“নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

অর্থাৎ এর সুনির্দিষ্ট সময় আছে। এর দলীল হলো রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“যে এমন কোনো কাজ করে যা আমাদের (শরী‘আতের) অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।”[62]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: আমি ২৪ বছর বয়সের আগে সালাত আদায় করি নি। এখন আমি প্রতি ফরয সালাতের সাথে আরেকবার ফরয সালাত আদায় করি। আমার জন্য কি তা করা জায়েয? আমি কি এভাবেই চালিয়ে যাব নাকি আমার ওপর অন্য কোনো করণীয় আছে?

---

[62] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

তিনি বলেন: “যে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে, সঠিক মতানুসারে তার ওপর কোনো কাযা নেই; বরং তাকে আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাওবা করতে হবে। কারণ, সালাত ইসলামের স্তম্ভ, তা ত্যাগ করা ভয়াবহ অপরাধসমূহের একটি; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তা (সালাত) ত্যাগ করা ‘বড় কুফর’ যা আলেমগণের দু’টি মতের মধ্যে সবচেয়ে সঠিকটি, কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

“আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হলো সালাত। তাই যে তা ত্যাগ করে, সে কাফের হয়ে গেলো।”[63]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »

“একজন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।”[64]

এক্ষেত্রে ভাই আপনার ওপর কর্তব্য হলো আল্লাহর নিকট সত্যিকার অর্থে তাওবা করা। আর তা হলো (১) পূর্বে যা গত হয়েছে তার ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া (২) সালাত ত্যাগ একেবারে ছেড়ে দেওয়া

[63] ইমাম আহমাদ ও সুনানের সংকলকগণ সহীহ ইসনাদ সূত্রে বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

[64] ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস রয়েছে, যাতে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এবং (৩) এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করা যে, এ কাজে আপনি আর কখনও ফিরে যাবেন না।

আর আপনাকে প্রতি সালাতের সাথে বা অন্য সালাতের সাথে কাযা করতে হবে না, বরং আপনাকে শুধু তাওবা করতে হবে। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর। যে তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: ٣١]

"হে মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له»

"পাপ থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো পাপই নেই"।[65]

তাই আপনাকে সত্যিকার অর্থে তাওবা করতে হবে, নিজের নাফসের সাথে হিসাব-নিকাশ করতে হবে, সঠিক সময়ে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সদা-সচেষ্ট থাকতে হবে, আপনার দ্বারা যা যা হয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং বেশি বেশি ভালো কাজ করতে হবে। আর আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ জানাই, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢ ﴾ [طه: ٨٢]

[65] ইবন মাজাহ: হাদীস নং ৪২৫০। [সম্পাদক]

“আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে, নিশ্চয় আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৮২]

সূরা আল-ফুরক্বান-এ শির্ক, হত্যা, যিনা (ব্যভিচার) উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠﴾ [الفرقان: ٦٧-٦٩]

“আর যে তা করল সে পাপ করল, কিয়ামাতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে এবং সে সেখানে অপমানিত অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করবে, তবে সে ছাড়া যে তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে। আল্লাহ তাদের খারাপ কাজসমূহকে ভালো কাজে পরিবর্তন করে দিবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।” [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৬৯-৭০]

আমরা আল্লাহর কাছে চাই আমাদের ও আপনার জন্য তাওফীক, বিশুদ্ধ তাওবা ও কল্যাণের পথে অবিচলতা।”[66]

দ্বিতীয়ত: আর সিয়াম কাযা করার ক্ষেত্রে, আপনার সিয়াম ত্যাগ করা যদি আপনার সালাত ত্যাগ করা অবস্থায় হয়, তবে আপনার ওপর সে সব দিনের, যে সব দিনে আপনি সাওম ভঙ্গ করেছেন তার কাযা করা ওয়াজিব নয়, কারণ যে সালাত ত্যাগ করে, সে বড় কুফর সংঘটনকারী কাফির (যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়)

[66] মাজমূ‘ ফাতাওয়া শাইখ ইবন বায (১০/৩২৯, ৩৩০)।

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর কোনো কাফির যদি ইসলাম কবুল করে, কুফর অবস্থায় সে যে ইবাদাতগুলো ত্যাগ করেছিল, তা কাযা করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

আর যদি আপনার সিয়াম ত্যাগ সালাত আদায় করা অবস্থায় হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রে শুধু দুটো সম্ভাব্য ব্যাপারই ঘটতে পারে:

প্রথমত: আপনি রাতে সিয়ামের নিয়্যাত করেন নি, বরং সাওম ভঙ্গের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে কাযা শুদ্ধ হবে না। কারণ আপনি কোনো ওযর (গ্রহণযোগ্য অজুহাত) ছাড়া শরী'আতে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করণীয় ইবাদাত ত্যাগ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: আপনি সিয়াম শুরু করার পর সেই দিনে তা ভঙ্গ করেছেন। এক্ষেত্রে আপনার ওপর কাযা করা ফরয। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রমযান মাসে দিনের বেলায় (যৌন) মিলনকারী ব্যক্তিকে কাফফারা আদায় করার আদেশ দিলেন, তখন বললেন: «صم يوماً مكانه» "তুমি সে দিনের পরিবর্তে একদিন সাওম পালন কর।"[67]

আর শাইখ ইবন উসাইমীনকে রমযান মাসে দিনের বেলা কোনো ওযর (সঙ্গতকারণ) ছাড়া সাওম ভঙ্গ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি উত্তরে বলেন: "রমযান মাসে দিনের বেলা কোনো ওযর ছাড়া সাওম ভঙ্গ করা সবচেয়ে বড় (কবীরা) গুনাহসমূহের একটি, এ দ্বারা

[67] আবু দাঊদ, হাদীস নং ২৩৯৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৬৭১ এবং আল-আলবানী "ইরওয়াউল গালীল"-এ (৯৪০) একে সহীহ বলেছেন।

সে ব্যক্তি ফাসিক্ব হয়ে যাবে। তার ওপর ওয়াজিব হবে আল্লাহর কাছে তাওবা করা, যেদিন সাওম ভঙ্গ করেছিল সেদিনের কাযা করা, অর্থাৎ সে যদি সাওম পালন শুরু করে দিনের মাঝে কোনো ওযর ছাড়া সাওম ভঙ্গ করেছে তার কাযা করতে হবে। কারণ যেহেতু সে সাওম শুরু করেছে, তার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল এবং তা ফরয এই বিশ্বাসে তাতে প্রবেশ করেছে, তাই তার ওপর এর কাযা করা বাধ্যতামূলক। নাযর (মান্নতের) এর ন্যায়।

আর যদি কোনো ওযর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু থেকেই সাওম ত্যাগ করে, তবে অধিক শক্তিশালী মতানুসারে তাকে তার কাযা আদায় করতে হবে না, কারণ সে এর দ্বারা কোনো উপকার পাবে না। এটি এজন্য যে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতিটি হলো সকল ইবাদাত যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত, তা কোনো ওযর (গ্রহণযোগ্য কারণ) ছাড়া সেই নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বে করা হলে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না। এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“যে এমন কোনো কাজ করে যা আমাদের (শারী‘আতের) অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।”[68]

কারণ, তা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করার মধ্যে পড়ে আর আল্লাহ তা‘আলা নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা যুলুম (অবিচার)।

[68] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

আর যালিম ব্যক্তির কাছ থেকে সেই যুলুম কবুল করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩﴾ [البقرة: ٢٢٩]

“আর যারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা হলো যালিম”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৯]

আর এটি এজন্য যে, সে যদি এই ইবাদাত নির্ধারিত সময় হবার আগে অর্থাৎ তা করার সময় শুরু হবার আগেই করত, তবে তা তার কাছ থেকে কবুল হত না। একই ভাবে সে যদি তা (সেই ইবাদাতের) সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে করে, তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল হবে না যদি না সে মা'যূর (অপারগ বা সঙ্গত কারণ বিশিষ্ট) হয়।”[69]

আর তার ওপর কর্তব্য হলো সকল পাপ কাজ থেকে (আল্লাহর কাছে) সত্যিকার অর্থে তাওবা করা (ইবন বাযের উল্লিখিত ফাতওয়ায় তাওবার তিনটি শর্তসহ), ফরয কাজসমূহ সময়মত অব্যাহত রাখা, খারাপ কাজ ত্যাগ করা, বেশি বেশি নফল ও নৈকট্য লাভ হয় এমন কাজ করা।

আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

সিয়ামের আয়াতে উল্লিখিত ফিদয়া-এর পরিমাণ

ফাতাওয়া নং ৪৯৯৪৪

প্রশ্ন: সিয়ামের আয়াতে উল্লিখিত ফিদয়া-এর পরিমাণ কি?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

---

[69] মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)।

প্রথমত: যে রমযান (মাস) পেল কিন্তু সিয়াম পালনে সক্ষম নয় অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার জন্য (অতি বার্ধক্যের কারণে) অথবা সে এমন রোগী যার সুস্থতা লাভের আশা করা যায় না, তার ওপর সিয়াম পালন ফরয নয়, অক্ষমতার জন্য। সে সাওম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤﴾ [البقرة: ١٨٣، ١٨٤]

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনটি ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো। নির্দিষ্ট কিছু দিনে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা সফরে আছে, সে যাতে অন্য দিনগুলোতে তা আদায় করে নেয়, আর (তোমাদের মধ্যে) যারা (তাতেও) অপারগ, তারা যেন ফিদয়া হিসেবে মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়, আর যে নাফল কল্যাণ হিসেবে তা (ফিদয়াহ) বেশি করে আদায় করে, তবে তা তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি সাওম রাখ তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তা তোমরা জানতে।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩-১৮৪]

আর ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "এটি মানসূখ (রহিত) নয়, বরং তা অতি বৃদ্ধ পুরুষ

ও নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা সাওম পালন করতে পারবে না, তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন।”[70]

আর ইবন কুদামাহ বলেছেন, “অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীর জন্য সাওম পালন যদি কঠিন ও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়, তবে তারা সাওম ভঙ্গ করতে পারেন আর সেক্ষেত্রে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন... তবে তিনি যদি (মিসকীন) খাওয়াতেও অক্ষম হন, তবে তার ওপর কিছু (কোনো দায়িত্ব) বর্তায় না। কেননা,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

আর সে রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় না সেও সাওম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। কারণ, সে বৃদ্ধ লোকের পর্যায়ভুক্ত।”[71]

আর ‘আল-মূসূ‘আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ’-তে (৫/১১৭) আছে:

“হানাফী, শাফে‘ঈ ও হাম্বলী (ফিকহী মাযহাবের) আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, ফিদয়া তখনই আদায় করা যাবে, যখন বার্ধক্যের বা এমন রোগ যার সুস্থতার আশা করা যায় না। এর কারণে সাওম ভঙ্গ করা দিনগুলোর কাযা আদায়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে। এর দলীল আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

[70] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫০৫।

[71] আল-মুগনীতে (৪/৩৯৬)।

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾ [البقرة: ١٨٤]

“আর যারা তাতে (সিয়াম পালনে) অক্ষম, তারা ফিদয়া হিসেবে মিসকীন খাওয়াবে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪] এর অর্থ যাদের ওপর সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য।

শাইখ ইবন উসাইমীন ‘ফাতাওয়া আস-সিয়াম (পৃ. ১১১)’-এ বলেছেন, আমাদের জানা উচিৎ যে, রোগী দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: এমন রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায়। যেমন, হঠাৎ হওয়া রোগ যার থেকে সুস্থতা আশা করা যায়। তার হুকুম হলো যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা সফরে আছে, সে যাতে অন্য দিনগুলোতে তা আদায় করে নেয়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

সে (এরূপ রোগী) শুধু সুস্থতার আশা করবে, এরপর সাওম পালন করে ফেলবে। যদি এমন হয় যে তার রোগ থেকেই গেল এবং সুস্থ হওয়ার আগেই সে মারা গেল, তবে তার ওপর কিছু বর্তায় না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর অন্য দিনগুলোতে কাযা ওয়াজিব করেছিলেন এবং তা পাওয়ার আগেই সে মারা গেছে। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রমযান আসার আগেই শা‘বান মাসে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে কাযা করতে হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন রোগ যা স্থায়ী। যেমন, ক্যান্সারের রোগ, (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) কিডনীর রোগ, ডায়াবেটিস বা এ ধরণের

স্থায়ী রোগ (যা অসহনীয়) যা থেকে রোগী সুস্থতা আশা করে না, সে রোগী রমযান মাসে সাওম ভঙ্গ করবে এবং এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবে ঠিক যেমন বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী, যারা সিয়াম পালনে সক্ষম নয়, তারা সাওম ভঙ্গ করে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়ায়। কুরআন থেকে এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾ [البقرة: ١٨٤]

“আর যারা তাতে (সিয়াম পালনে) অক্ষম, তারা যেন ফিদয়া হিসেবে মিসকীন খাওয়ায়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

দ্বিতীয়ত: আর ইত'আম-এর (খাওয়ানোর) পদ্ধতি হলো প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধেক সা' (প্রায় ১.৫[72] কিলোগ্রাম) খাবার। যেমন, চাল বা ইত্যাদি দেওয়া অথবা খাবার বানিয়ে মিসকীনদের ডেকে খাওয়ানো।

ইমাম বুখারী বলেছেন, ‘আর বৃদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি সাওম পালনে সক্ষম নন, যেমন আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বৃদ্ধ হওয়ার পর একবছর বা দুইবছর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে রুটি ও গোশত খাইয়েছেন এবং সাওম ভঙ্গ করেছেন’।

শাইখ ইবন বাযকে একজন অতি বৃদ্ধা নারী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল যিনি সাওম পালনে সক্ষম নন, তিনি কী করবেন?

তিনি উত্তরে বলেন: ‘তাকে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে আধা সা' খাবার খাওয়াতে হবে, তা সে দেশের খাদ্য দ্রব্য থেকে

[72] ১.০৪০

যেমন- খেজুর বা চাল বা এছাড়া অন্যান্য কিছু থেকে। ওজন হিসেবে এর পরিমাণ হলো প্রায় দেড় (১.৫) কিলোগ্রাম। যেমনি নবীর একদল সাহাবী ফাতওয়া দিয়েছেন, যাদের মাঝে ইবন আব্বাসও আছেন। আর যদি তিনি (অতি বৃদ্ধা নারী) দরিদ্র হন অর্থাৎ খাওয়াতে সক্ষম না হন, তবে তার ওপর কিছু বর্তায় না, আর এই কাফফারা একজন (মিসকীন)-কে বা অনেকজনকে (মিসকীনদের) দেওয়া যেতে পারে মাসের শুরুতে বা এর মাঝে বা এর শেষে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।’[73]

আর শাইখ ইবন উসাইমীন বলেছেন, ‘তাই চিরস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগী, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যারা বয়স্ক, তারা যদি সাওম পালনে অক্ষম হয়, তবে তাদের ওপর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব। ফকিরকে খাবার দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে হোক বা মাসের দিনের সমান সংখ্যক ফকিরদের দাওয়াত করে খাওয়ানো খাওয়ানো হোক, যেভাবে আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বৃদ্ধ হওয়ার পর করতেন, তিনি এক মাসের পরিবর্তে ৩০ জন মিসকীনকে একত্রে দাওয়াত করে খাওয়াতেন।’[74]

ফাতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে (১১/১৬৪) প্রশ্ন করা হয়েছিল, অক্ষম ব্যক্তি যেমন, বার্ধক্যের কারণে অক্ষম, বৃদ্ধ ব্যক্তি ও বৃদ্ধা নারী, এমন রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় না রমযান মাসে তার ইত‘আম (মিসকীন খাওয়ানো) সম্পর্কে।

---

[73] মাজমূ‘ ফাতওয়া ইবন বায (১৫/২০৩)।

[74] ফাতওয়া আস-সিয়াম, (পৃ. ১১১)।

তারা উত্তরে বলেন: 'যে বার্ধক্যের কারণে রমযানে সাওম পালনে অক্ষম, যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তি ও বৃদ্ধা নারী অথবা সাওম পালন যার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য, তার সাওম ভঙ্গের ব্যাপারে শিথিলতা আছে, তার জন্য প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব, তা হলো গম, খেজুর, চাল বা এজাতীয় খাবার যা সে নিজ পরিবারকে খাওয়ায় তার অর্ধেক স‌া' প্রদান করা। একইভাবে এমন অসুস্থ ব্যক্তিও, যিনি সাওম পালনে অক্ষম বা তা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা তা থেকে সুস্থতা আশা করা যায় না, সেও তাই করবে।' এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।" [আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

এবং আরও রয়েছে তাঁর বাণী:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ ﴾ [الحج: ٧٨]

"আর তিনি (আল্লাহ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কাঠিন্য রাখেন নি।" [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৮] এবং তাঁর বাণী:

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: ١٨٤]

"আর যারা তাতে (সিয়াম পালনে) অক্ষম, তারা যেন ফিদয়া হিসেবে মিসকীন খাওয়ায়।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

তারাবীহের সালাতের রাকাত সংখ্যা

ফাতাওয়া নং ৯০৩৬

প্রশ্ন: আমি প্রশ্নটি আগেও করেছিলাম। আশা করি এর উত্তর দিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন কারণ আমি এর কোনো সন্তোষজনক জবাব পাই নি। প্রশ্নটি হলো তারাবীহ সম্পর্কে, তা কি ১১ রাকাত নাকি ২০ রাকাত? সুন্নাহ মতে তো তা ১১ রাকাত। শাইখ আল-আলবানী রহ. 'আল-ক্বিয়াম ওয়া আত-তারাউয়ীহ' বইতে বলেছেন (তা) ১১ রাকাত। কেউ কেউ সেই মসজিদে যায় যেখানে ১১ রাকাত সালাত আদায় হয়, আবার অনেকে সেই মসজিদে যায়, যেখানে ২০ রাকাত সালাত আদায় হয়। তাই এই মাসআলাটি এখানে যুক্তরাষ্ট্রে সংবেদনশীল হয়ে গেছে। যে ১১ রাকাত সালাত আদায় করে সে ২০ রাকাত সালাত আদায়কারীকে দোষারোপ করে, আবার এর বিপরীতটিও হয়। তাই (এই ব্যাপারটি নিয়ে) ফিতনাহ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি মসজিদুল হারামেও ২০ রাকাত সালাত আদায় করা হয়। কেন মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে সুন্নাহ থেকে বিপরীত করা হয়? কেন তারা মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে ২০ রাকাত তারাবীহের সালাত আদায় করেন?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আমরা মনে করি না যে আলেমগণের মধ্যে ইজতিহাদী মাসআলাসমূহ নিয়ে একজন মুসলিমের এ ধরনের সংবেদনশীল আচরণ করা উচিৎ যা মুসলিমদের মাঝে বিভেদ ও ফিতনাহ সৃষ্টির কারণ হয়।

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ১০ রাকাত আদায় করে বিতর-এর সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং ইমামের সাথে তারাবীহের সালাত পূর্ণ করে না, তার সম্পর্কিত মাস'আলাহর ব্যাপারে বলতে গিয়ে শাইখ ইবন উসাইমীন রহ. উল্লেখ করেন: 'এটি খুবই দুঃখজনক যে, আমরা এই উন্মুক্ত ইসলামী উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল দেখি যারা ভিন্ন মতের সুযোগ আছে এমন ব্যাপার নিয়ে বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে তারা সেই ভিন্ন মতকে অন্তরসমূহের বিভেদের কারণ বানিয়ে দেয়। সাহাবীগণের সময় থেকেই এই উম্মাতের মাঝে ভিন্ন মত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্তরসমূহ ছিল ঐক্যবদ্ধ।

তাই ইসলামের ব্যাপারে একনিষ্ঠ সকলের ওপর, বিশেষ করে যুবকদের ওপর ওয়াজিব হলো ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত হওয়া; কারণ শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ওঁত পেতে আছে।'[75]

আর এই মাসআলা এর ব্যাপারে দু'টি দল বাড়াবাড়ি করেছে। প্রথম দলটি যারা ১১ রাকাতের বেশি পড়েছে তাদের বিরোধিতা করেছে আর তাদের কাজকে বিদ'আত হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আর দ্বিতীয় দলটি, শুধু ১১ রাকাতই পড়ে ও এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন, তাদের বিরোধিতা করে বলেছে যে, তারা ইজমা'-এর বিপরীতে গেছে।

চলুন আমরা শুনি সম্মানিত শাইখ ইবন উসাইমীন রহ.-এর উপদেশ যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমরা এক্ষেত্রে বলব আমাদের উচিৎ না বেশি বাড়াবাড়ি বা অতিরিক্ত কম করা। কেউ কেউ সুন্নাহ-তে বর্ণিত

[75] আশ-শারহ আল-মুমতি' (৪২২৫)।

সংখ্যা মানার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং বলে: সুন্নাহ তে যে সংখ্যার বর্ণনা এসেছে তা থেকে বাড়ানো জায়েয নয়। সুতরাং যে তা (১১ রাকাত) থেকে বাড়িয়ে পড়ে, সে তার কঠোর বিরোধিতা করে এবং বলে, সে পাপী, সীমালঙ্ঘনকারী।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি (এমন ধারনা) ভুল, সে কীভাবে পাপী, সীমালঙ্ঘনকারী হবে যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন:

«مثنى مثنى»

“(তা) দুই দুই (রাকাত) করে”।[76]

তিনি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দেন নি। আর এটি জানা কথা যে, যিনি রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি তার (রাকাতের) সংখ্যা জানতেন না। কারণ, যিনি (সালাতের) পদ্ধতি জানেন না, তার রাকাত সংখ্যা না জানারই কথা। আর তিনি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবকও ছিলেন না যে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তিনি রাসূলের বাসার ভিতরে কি হচ্ছে তা জানতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সে ব্যক্তিকে রাকাত সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তাই এটি জানা গেল যে, এ ব্যাপারটিতে প্রশস্ততা আছে। সুতরাং কেউ ১০০ রাকাত সালাত আদায় করে ১ রাকাত দিয়েও বিতর আদায় করতে পারে।

আর তাঁর বাণী:

---

[76] বুখারী, হাদীস নং ৪৭২; মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৯। [সম্পাদক]

«صلوا كما رأيتموني أصلي»

“তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে সালাত আদায় কর।”[77]

এটি তাদের কাছেও সাধারণভাবে (সর্বক্ষেত্রে) প্রযোজ্য (হুকুম) নয়। আর এ কারণেই তারা একবার ৫ রাকাত, আর একবার ৭ রাকাত, অন্যবার ৯ রাকাত দিয়ে বিতর আদায় করা ওয়াজিব মনে করে না। আর আমরা যদি একে (হাদীসকে) সাধারণভাবে প্রযোজ্য ধরে নেই তাহলে আমাদের এ কথা বলতে হবে যে একবার ৫ রাকাত, আর একবার ৭ রাকাত, অন্যবার ৯ রাকাত দিয়ে ধরে ধরে বিতর আদায় করা ওয়াজিব, বরং “তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে সালাত আদায় কর”-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সালাত আদায়ের পদ্ধতি, রাকাত সংখ্যা নয়। কেবল যে নির্দিষ্ট রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে দলীল প্রমাণিত হয়েছে তা ব্যতীত।

আর যাই হোক, একজন মানুষের জন্য যাতে প্রশস্ততা আছে এমন কোনো ব্যাপারে লোকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। ব্যাপারটি এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, আমরা দেখেছি যে কিছু ভাইয়েরা এ বিষয়টিতে বেশি জোর প্রয়োগ করে, তারা সেসব ইমামগণের ওপর বিদ‘আতের অপবাদ দেয়, যারা ১১ রাকাতের বেশি আদায় করে এবং তারা মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে। এক্ষেত্রে তাদের সাওয়াব ছুটে যায়, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة»

[77] বুখারী, হাদীস নং ৬৩১।

“যে ইমামের সাথে ইমাম (সালাত সমাপ্ত করে) চলে যাওয়া পর্যন্ত কিয়াম করে, তার জন্য সম্পূর্ণ রাতের কিয়াম (এর সাওয়াব) লিখা হবে।”[78]

আবার তারা অনেক সময় ১০ রাকাত আদায় করে বসে থাকে ফলে কাতার ভঙ্গ হয়, আবার কখনও তারা কথা বলাবলি করে এবং মুসল্লীদের সালাতে বিঘ্ন ঘটায়।

আমরা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করি না যে, তারা ভালো চান এবং তারা ইজতিহাদ করেছেন, কিন্তু সব মুজতাহিদ সঠিক মতে পৌঁছেন না।

আর দ্বিতীয় পক্ষটি হলো তাদের বিপরীত। তারা, যারা ১১ রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদের কঠোর বিরোধিতা করে এবং বলে: ‘তুমি ইজমা‘ থেকে বের হয়ে গেছ।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ [النساء: ١١٥]

“আর যে তার কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে আমরা তাকে সেদিকে পরিচালিত করব, যেদিকে সে অভিমুখী হয় এবং আমরা তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে আর তা কতই না খারাপ প্রত্যাবর্তন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫]

78 তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৬ এবং আল-আলবানী ‘সহীহ আত-তিরমিযী’-তে (৬৪৬) একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

আর আপনার আগে যারা গত হয়েছে তারা ২৩ রাকাত ছাড়া কোনো কিছু জানতেন না। এরপর তারা এ মতের বিরোধীদের ওপর কঠোরভাবে আক্রমন করে বসে। এটিও একটি ভুল।”[79]

আর তারাবীহের সালাতে ৮ রাকাতের বেশি পড়া জায়েয না হওয়ার মত পোষণকারীরা যে দলীল দিয়েছেন তা হলো, আবু সালামাহ ইবন আবদির রাহমানের হাদীস, যাতে তিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে প্রশ্ন করেছিলেন:

«كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقــالت: ما كان يزيد في رمضــان ولا في غــيره على إحــدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطــولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حســنهن وطــولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تــوتر قــال يا عائشة إن عيــنيَّ تنامــان ولا ينــام قلبي»

“রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত কেমন ছিল?” তিনি বললেন: তিনি (রাসূলুল্লাহ) রমযানে বা এর বাইরে ১১ রাকতের বেশি আদায় করতেন না, তিনি ৪ রাকাত সালাত আদায় করতেন- এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত!), এরপর তিনি আরও ৪ রাকাত সালাত আদায় করতেন -এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত!), এরপর তিনি ৩ রাকাত সালাত আদায় করতেন। আমি (আয়েশা) (বিতরের আগে শুতে দেখে) বললাম: ‘হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমিয়ে

[79] আশ-শারহ আল মুমতি‘ (৩/৭৩-৭৫)।

নিবেন?' তিনি বললেন, 'হে আয়েশা, আমার দুই চোখ তো ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।'[80]

তারা বলেন: এই হাদীস থেকে রমযানে ও এর বাইরে রাতের বেলা সালাতের (রাকাত সংখ্যার) ব্যাপারে নিয়মিত থাকার নির্দেশনা পাওয়া যায়।

আর আলেমগণ এ হাদীসকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আচরণের (কাজের) দলীল হিসেবে পেশ করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা (তাঁর) কাজ (আচরণ) থেকে ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

আর রাতের সালাত যেমন তারাবীহ, যা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত নয়। এ ব্যাপারে (বর্ণিত) স্পষ্ট দলীলগুলোর একটি হলো, ইবন উমারের হাদীস, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى».

"রাতের সালাত দুই দুই (রাকাত) করে, এরপর আপনাদের মধ্যে যে ভোর (ফজর) হবার আশংকা করে তিনি যেন এক রাকাত পড়ে নেন, যা আদায় করা সালাতের উইতর (বিতর, সালাতের রাকাত সংখ্যাকে বেজোড় করা) হিসেবে গণ্য হবে।"[81]

[80] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৩৮।

[81] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৯।

বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য (ফিকহী) মাযহাবসমূহের আলেমগণের মতামতের দিকে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হয় যে, এ ব্যাপারটিতে প্রশস্ততা আছে, আর ১১ রাকাতের বেশি পড়ায় কোনো দোষ নেই।

ইমাম আস-সারখাসী, যিনি হানাফী (ফিকহী) মাযহাবের ইমামগণের একজন, তিনি বলেছেন, 'আমাদের মতে বিতর ছাড়া তা (তারাবীহ) ২০ রাকাত।'[82]

ইবন কুদামাহ বলেছেন, আবু আবদিল্লাহ (ইমাম আহমাদ) রহ.-এর কাছে পছন্দনীয় মতটি হলো, তা ২০ রাকাত। আর ইমাম আস-সাউরী, ইমাম আবু-হানীফা ও ইমাম আশ-শাফে'ঈ-ও এ মত ব্যক্ত করেছেন। আর ইমাম মালিক বলেছেন: 'তা (তারাবীহ) ৩৬ রাকাত।"[83]

ইমাম আন-নাববী বলেছেন, 'আলেমগণের ইজমা' মতে তারাবীহের সালাত সুন্নাহ। আর আমাদের মাযহাবে তা ১০ সালামে ২০ রাকাত। তা একাকী ও জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয।"[84]

এগুলো হলো তারাবীহের সালাতের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে চার ইমামের মাযহাবসমূহ, তাদের সবাই ১১ রাকাতের বেশি পড়ার ব্যাপারে বলেছেন। যে কারণে তারা ১১ রাকাতের বেশি পড়ার ব্যাপারে বলেছেন সম্ভবত তা হলো:

---

[82] আল-মাবসূত (২/১৪৫)।

[83] আল-মুগনী (১/৪৫৭)।

[84] আল-মাজমূ' (৪/৩১)।

১. তারা দেখেছেন যে, আয়েশাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করে না।

২. পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবে‘ঈগণের অনেকের কাছ থেকে (১১ রাকাতের) বেশি পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।[85]

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ১১ রাকাত সালাত আদায় করতেন তা এতটা দীর্ঘ করতেন যে, তার পুরো রাতই লেগে যেত, এমনকি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহের সালাতে তাঁর সাহাবীগণের সাথে যে সালাত আদায় করেছিলেন তা ফজর (সুবহে সাদিক) উদিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছিলেন, এমনকি সাহাবীগণ সাহরী ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। সাহাবীগণও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন এবং তারা তা দীর্ঘ মনে করতেন না। তাই আলেমগণ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে ইমাম যদি এভাবে সালাত দীর্ঘ করেন তবে তা মুসল্লীদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়, যা তাদেরকে (সালাত থেকে) বিমুখ করতে পারে, এমতাবস্থায় ইমাম কিরাত সংক্ষিপ্ত করে রাকাত সংখ্যা বাড়াতে পারেন।

সারকথা হলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে ১১ রাকাত সালাত পড়ে সে ভালো করল এবং সুন্নাহ পালন করল। আর যে কিরাত সংক্ষিপ্ত করে রাকাতের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে সেও ভালো করল। যে এই দু’টি বিষয়ের যে কোনো একটি করল, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

---

[85] আল-মুগনী (২/৬০৪); আল-মাজমূ‘ (৪/৩২)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'যে তারাবীহের সালাত আবু হানীফাহ, আশ-শাফে'ঈ ও আহমাদ-এর মাযহাব অনুসারে ২০ রাকাত আদায় করল অথবা মালিকের মাযহাব অনুসারে ৩৬ রাকাত আদায় করল অথবা ১৩ বা ১১ রাকাত আদায় করল সে ভালো করল, যেমনটি ইমাম আহমাদ মত পোষণ করেছেন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকার কারণে। তাই রাকাত সংখ্যা বেশি বা কম করা কিয়াম দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা অনুযায়ী হবে।'[86]

আস-সুয়ূত্বী বলেছেন, 'রমযানে কিয়াম করার আদেশ দিয়ে ও এর ব্যাপারে উৎসাহিত করে সহীহ ও হাসান হাদীসসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এমনও প্রমাণিত হয় নি যে, তিনি ২০ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন; বরং তিনি রাতের সালাত আদায় করেছেন যার (রাকাতের) সংখ্যা উল্লেখ হয় নি। এরপর তিনি ৪র্থ রাতে দেরি করলেন এই আশঙ্কায় যে, তা (তারাবীহের সালাত) তাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হবে, আর তারা তা (পালন) করতে অসমর্থ হবেন।' ইবন হাজার আল-হাইসামী বলেছেন: 'নবী-সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তারাবীহের সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় নি। আর এই ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে, "তিনি ২০ রাকাত সালাত আদায় করতেন, তা অত্যন্ত দুর্বল।"[87]

[86] আল-ইখতিয়ারাত (পৃ. ৬৪)।

[87] আল-মূসূ'আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ (২৭/১৪২-১৪৫)।

আর এইসবের পর প্রশ্নকারী ভাই, আপনি তারাবীহের সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে অবাক হবেন না। কারণ, এর আগে ইমামগণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা করেছেন। আর তাদের সবার মধ্যেই কল্যাণ আছে।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

আমরা কীভাবে লাইলাতুল কদর পালন করব এবং তা কোনো দিন?

ফাতওয়া নং ৩৬৮৩২

প্রশ্ন: আমাদের লাইলাতুল কদর কীভাবে পালন করা উচিৎ? তা কি সালাত আদায় করার মাধ্যমে নাকি কুরআন তিলাওয়াত, রাসূলের সীরাহ পাঠ, আদেশ উপদেশ দেওয়া/শোনা ও মসজিদে অনুষ্ঠান উদযাপন করার মাধ্যমে পালন করতে হবে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এমনভাবে সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ও দো‘আ পাঠের মাধ্যমে মনোনিবেশ করতেন, যা অন্য সময়ে করতেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, (রমযানের) শেষ দশ রাত্রি শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জাগতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং স্ত্রী-মিলন থেকে বিরত থাকতেন। আহমাদ এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, ‘তিনি শেষ দশ দিন এমনভাবে মনোনিবেশ করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না।’

দ্বিতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদরে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করতে উৎসাহিত করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»

“ঈমানের সাথে ও প্রতিদানের আশায় যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে জেগে কিয়াম করবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”[88]

আর এই হাদীসে লাইলাতুল কদরে রাত জেগে কিয়াম করার শরী‘আতসম্মত হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে।

তৃতীয়ত: লাইলাতুল কদরে সবচেয়ে ভালো দো‘আসমূহের মধ্যে একটি পাঠ করা যায় যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইমাম তিরমিযী এটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ‘হে রাসূলুল্লাহ! যদি আমি জানি কোনো রাতে লাইলাতুল কদর তবে আমি সেই রাতে কি বলব?’ তিনি বললেন, বল:

«اللّٰهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني »

“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউউন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা ‘ফুউ ‘আন্নী” (হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালোবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।)”[89]

চতুর্থত: রমযানে লাইলাতুল কদরের রাত ঠিক কোনোটি, এটি জানার জন্য বিশেষ সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলো অন্যান্য রাতের চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় এবং সাতাশতম রাত (শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে)

[88] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[89] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫১৩। [সম্পাদক]

লাইলাতুল কদর হওয়ার ব্যাপারে বেশি সম্ভাবনাময়। যেমনটি আমরা এ ব্যাপারে নির্দেশ করে এমন হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি।

পঞ্চমত: আর বিদ‘আত কাজসমূহ, তা কখনই রমযান বা রমযানের বাইরে কোনো সময়েই জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»

“যে আমাদের এই বিষয়ে (শরী‘আতে) নতুন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”[90]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»

“যে কোনো কাজ করল যা আমাদের বিষয়ের (শরী‘আতের) অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।[91]”

আর রমযানের কিছু নির্দিষ্ট রাতে অনুষ্ঠান উদযাপনের ব্যাপারে কোনো ভিত্তি আমাদের জানা নেই। সবচেয়ে ভালো পথ-নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ এবং সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে (শারী‘আতে) নতুন প্রবর্তিত বিষয়সমূহ (বিদ‘আত)।

আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

[90] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮, তবে মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে ما ليس منه [সম্পাদক]

[91] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

গবেষণা ও ফাতওয়া ইস্যুকারী আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ (১০/৪১৩)

ইসলাম কিউ.এ

নির্দিষ্ট কোনো রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে নির্ধারণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

ফাতওয়া নং ৫০৬৯৩

প্রশ্ন: অন্য কোনো রাত্রিতে না আদায় করে শুধু মাত্র লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে তাহাজ্জুদ এর সালাত আদায়ের ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত: লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে ইবাদাত করার মহান ফযীলাতের ব্যাপারে দলীল রয়েছে। আমাদের রব বলেছেন,

﴿ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ۝٣ ﴾ [القدر: ٣]

“এই রাতের ইবাদাত হাজার রাতের চেয়ে উত্তম” [সূরা আল-কদর, আয়াত: ৩]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে কিয়াম করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[92]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ۝١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ۝٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ۝٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ۝٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ۝٥ ﴾ [القدر: ١- ٥]

[92] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০১; সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস নং ৭৬০।

“নিশ্চয় আমরা একে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি এবং আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম। এতে ফিরিশতাগণ এবং রূহ (জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম) তাদের রবের অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে। শান্তিময় (বা নিরাপত্তাপূর্ণ) সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।” [সূরা আল-কদর, আয়াত: ১-৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“যে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে কিয়াম করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[93]

এখানে “ঈমান সহকারে” এর অর্থ: এই রাতের মর্যাদা ও তাতে আমল করা, শরী‘আতসম্মত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা।

আর “প্রতিদানের আশায়” এর অর্থ: আল্লাহ তা‘আলার জন্য নিয়্যাতের ব্যাপারে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) পোষণ করা।

দ্বিতীয়ত: লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট কোন্ রাত তা নিয়ে আলেমদের মাঝে এত ভিন্নমত রয়েছে যে তা ৪০-এরও বেশি মতামত পর্যন্ত পৌঁছেছে যেমনটি ‘ফাতহ আল-বারী’-তে উল্লেখ হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক মতটি হলো তা রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতের কোনো একটি।

[93] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬০।

‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» .

“লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে অনুসন্ধান কর।”[94]

ইমাম বুখারী এই হাদীসটিকে (রমযানের) ‘শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান’ নামক অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই রাতটি নির্দিষ্ট কোনো দিনে তা অপ্রকাশিত রাখার পেছনে হিকমাহ (রহস্য) হলো মুসলিমদেরকে রমযানের শেষ দশকের সবগুলো রাতেই ইবাদাত, দো‘আ ও যিকির করার ব্যাপারে তৎপর হতে সক্রিয় করানো। একই হিকমাহ-এর কারণে জুমু‘আর দিনে ঠিক কোনো সময়টিতে দো‘আ কবুল করা হয় তাও নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি এবং আল্লাহ তা‘আলার সেই ৯৯ টি নামও নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি, যে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“যে তা (৯৯ টি নাম) গণনা করবে, [অর্থাৎ (১) মুখস্ত করবে, (২) এর অর্থ বুঝবে, (৩) সে অনুযায়ী আমল করবে] সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[95]

হাফিয ইবন হাজার রহ. বলেছেন, “তার (ইমাম বুখারীর) বক্তব্য ‘অধ্যায়: রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল কদর

---

[94] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৯।

[95] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৭।

অনুসন্ধান’ এই পাঠ থেকে রমযান মাসেই যে লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরপর এর (রমযানের) শেষ দশকে এবং এরপর এর (শেষ দশকের) বিজোড় রাতগুলোর যে কোনো একটিতে। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো রাতে নয়। এই সংক্রান্ত একাধিক বর্ণনা থেকে আমরা অনুরূপ ইঙ্গিত পাই।”[96]

তিনি আরও বলেছেন, “আলেমগণ বলেন, এই রাতটির নির্দিষ্ট তারিখ গোপন রাখার পেছনে হিকমাহ হলো মানুষ এটি পাওয়ার জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। তবে নির্দিষ্ট তারিখ জানা থাকলে মানুষ শুধু সেই রাতেই ইবাদাত সীমাবদ্ধ রাখত যেমনটি এর আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জুমু‘আর দিনের (দো‘আ কবুলের) সুনির্দিষ্ট সময়ের (অজানা থাকার) ব্যাপারে।”

তৃতীয়ত: এই মতের ভিত্তিতে কারো পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় কোনো নির্দিষ্ট রাতটি ‘লাইলাতুল কদর’। বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি কোনো রাত তা সুনির্দিষ্টভাবে উম্মাতকে জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা এই জ্ঞান উঠিয়ে নিয়েছেন।

উবাদাহ ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘লাইলাতুল কদর’-এর ব্যাপারে খবর দিতে বের হলেন, (এ সময়) মুসলিমদের মধ্যে দু ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হলো। তিনি বললেন:

[96] ফাতহুল বারী (৪/২৬০)।

«إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ».

“আমি আপনাদেরকে ‘লাইলাতুল কদর’-এর ব্যাপারে খবর দিতে বের হয়েছিলাম, কিন্তু অমুক এবং অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হলো, এরপর তা (সেই জ্ঞান) উঠিয়ে নেওয়া হলো, আশা করি তা আপনাদের জন্য বেশি ভালো হয়েছে, আপনারা তা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ম) এবং পঞ্চমে (২৫ম তারিখে) অনুসন্ধান করুন।”[97]

ফাতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন, “রমযান মাসে নির্দিষ্ট কোনো রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সুস্পষ্ট দালীলের প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর কোনো একটিতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর (এর মধ্যে) সাতাশ তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি, যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিভিন্ন হাদীসসমূহে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।”[98]

তাই নির্দিষ্ট কোনো রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে চিহ্নিত করা একজন মুসলিমের জন্য উচিৎ নয়। কারণ, এতে এমন ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চয়তা পোষণ করা হয়, যে ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চয়তা পোষণ করা সম্ভব নয়। আর এতে অনেক কল্যাণ ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে এটি ২১তম রাতে অথবা ২৩তম রাতে অথবা ২৯তম

[97] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯

[98] ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল বুহূস আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (১০/৪১৩)

রাতে। তাই সে যদি শুধু ২৭তম রাতে কিয়াম করে তবে তার থেকে অফুরন্ত কল্যাণ ছুটে যেতে পারে, আবার হতে পারে সে এই মুবারাক রাত হারিয়ে ফেলতে পারে।

সুতরাং একজন মুসলিমের উচিৎ গোটা রমযান জুড়েই আনুগত্য ও ইবাদাতের কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো, আর শেষ দশকে সে ব্যাপারে বেশি তৎপর হওয়া। এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

“(রমযানের শেষ) দশ রাত্রি শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমর বেঁধে নামতেন, তিনি নিজে তাঁর রাত জাগতেন (ইবাদতের মাধ্যমে) এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগাতেন (ইবাদতের জন্য)।”[99]

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

[99] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৪।

ই'তিকাফের মূল আদর্শ, কেন মুসলিমরা এই সুন্নাহ ছেড়ে দিয়েছে?

ফাতওয়া নং ৪৯০০৭

প্রশ্ন: কেন মুসলিমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ হওয়া সত্ত্বেও ই'তিকাফ ছেড়ে দিয়েছে? আর ই'তিকাফের মূল লক্ষ্যই বা কী?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য

প্রথমত: ই'তিকাফ হলো মুআক্কাদা সুন্নাহ, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত পালন করতেন।

এর শরী'আতসম্মত হওয়ার ব্যাপারে দলীলগুলো দেখুন (৪৮৯৯৯) প্রশ্নের উত্তরে।

আর এই সুন্নাহ তো মুসলিমদের জীবন থেকে হারিয়েই গেছে (সে ব্যতীত যাকে আমার রব দয়া করেছেন) এর অবস্থা সে সুন্নাহগুলোর মতই যা মুসলিমরা একেবারেই ত্যাগ করেছে বা একেবারে ত্যাগ করার পথে।

আর এর কিছু কারণ রয়েছে। যেমন,

১. অনেকের মনে ঈমানের দুর্বলতা।

২. দুনিয়ার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাসের প্রতি অত্যধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়া। যার কারণে তারা অল্প সময়ের জন্য হলেও এসব থেকে দূরে থাকতে অক্ষম।

৩. অনেক মানুষের মনে জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষার অভাব এবং আরাম-আয়েশের দিকে তাদের ঝুঁকে পড়া, তাই তারা ই'তিকাফের

সামান্য কষ্টও সহ্য করতে চায় না যদিও তা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হোক না কেন।

যে জান্নাতের মহান মর্যাদা ও তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জানে, সে তার জন্য তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কুরবান করে হলেও তা লাভের চেষ্টা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ»

"নিশ্চয় আল্লাহর পণ্য অত্যন্ত মূল্যবান, আর নিশ্চয় আল্লাহর পণ্য হচ্ছে জান্নাত।"[100]

৪. অনেকের মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভালোবাসা শুধু মৌখিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকা, বাস্তব তথা কর্মগত দিকে তার কোনো প্রয়োগ না থাকা। অথচ এ ভালোবাসার বাস্তব চিত্র হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়ণ করা। আর সে সুন্নাতসমূহের একটি হলো ই'তিকাফ। আল্লাহ বলেছেন,

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١ ﴾ [الاحزاب: ٢١]

"নিশ্চয় রাসূলুল্লাহর মাঝে আছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তার জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

ইবন কাসীর রহ. বলেছেন,

[100] তিরমিযী এবং আল-আলবানী একে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন (২৪৫০)।

“এই সম্মানিত আয়াতটি রাসূলুল্লাহর সকল কথা, কাজ ও অবস্থা (সুন্নাহ) সর্বাবস্থায় অনুসরণের ব্যাপারে একটি মহান নীতি।”[101]

পূর্ববর্তী সাহাবী, তাবি‘ঈ ও আতবা‘উত তাবি‘ঈগণের অনেকে মানুষদের ই‘তিকাফ ছেড়ে দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়মিত করেছেন।

ইবনু শিহাব আয-যুহরী বলেছেন,

“এটি খুবই আশ্চর্যজনক যে, মুসলিমরা ই‘তিকাফ ত্যাগ করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে প্রবেশ করার পর থেকে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করা পর্যন্ত তিনি ই‘তিকাফ ত্যাগ করেন নি।”

দ্বিতীয়ত: যে ই‘তিকাফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে পালন করেছেন, তা হলো রমযান মাসের শেষ দশ দিনে। এই কয়টি দিন সত্যিকার অর্থে একটি ইনটেনসিভ শিক্ষামূলক কোর্সের ন্যায় যার ইতিবাচক তড়িৎ ফসল একজন মানুষের জীবনে ই‘তিকাফের দিন ও রাতগুলোতেই পরিলক্ষিত হয়। আর এর আরও ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে একজন মানুষের জীবনে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত, তার আগামী দিনগুলোতে।

তাই আমাদের মুসলিম সমাজে কতই না প্রয়োজন এই সুন্নাহকে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক পন্থায় তা প্রতিষ্ঠা করা, যার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন। মানুষের এই গাফিলতি ও উম্মাতের এই ফাসাদের সময় যারা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের পুরষ্কার কতই না মহান হবে!

---

[101] ইবন কাসীর (৩/৭৫৬)।

তৃতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ই'তিকাফের মূল লক্ষ্য ছিল, লাইলাতুল কদরের খোঁজ করা।

ইমাম মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ (أي: خيمة صغيرة) عَلَى سُدَّتِهَا (أي: بابها) حَصِيرٌ . قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ ، فَدَنَوْا مِنْهُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন। এরপর তিনি মাঝের দশ দিন তুর্কী কুব্বাহ-তে (এক ধরণের ছোট তাঁবুতে) ই'তিকাফ করেছিলেন যার দরজায় একটি কার্পেট ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) তাঁর হাত দিয়ে কার্পেটটিকে কুব্বাহর এক পাশে সরিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর মাথা বের করে লোকদের সাথে কথা বললেন, তারা (উপস্থিত লোকেরা) তাঁর (রাসূলের) কাছে আসলেন। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন,

«إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ»، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ »

"আমি প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করেছি, এই রাতের (লাইলাতুল কদরের) খোঁজে, এরপর মাঝের দশ দিন ই'তিকাফ করেছি, এরপর আমার কাছে এসে বলা হলো: 'এটি শেষ দশকে'। সুতরাং আপনাদের

মাঝে যে ই'তিকাফ করতে পছন্দ করে/চায়, সে যাতে ই'তিকাফ করে।" এরপর লোকেরা তাঁর সাথে ই'তিকাফ করলেন।[102]

এই হাদীসে কিছু শিক্ষণীয় দিক রয়েছে:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ই'তিকাফের মূল লক্ষ্য ছিল লাইলাতুল কদরের খোঁজ করা, আর সেই রাতে কিয়াম করা ও তা উজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। আর তা হলো এই রাতের মহান ফযীলতের কারণে। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ۝٣ ﴾ [القدر: ٣]

"লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকেও উত্তম।" [সূরা আল-কদর, আয়াত: ৩]

২. এর (এই রাতের) সময়সীমা জানার আগে তা খোঁজার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া। তিনি শুরু করেন প্রথম দশ দিনে, এরপর মাঝের দশ দিনে, এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে জানানো হয় যে, তা (লাইলাতুল কদর) শেষ দশকে। আর এ হলো লাইলাতুল কদরের খোঁজে এক সর্বাত্মক সাধনা।

৩. সাহাবীগণের রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ই'তিকাফ শুরু করে মাসের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছিলেন, আর তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের পূর্ণাংগভাবে অনুসরণের কারণে।

---

[102] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৭।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি ভালোবাসা ও দয়া। ই'তিকাফের কষ্টের কথা তাঁর জানা ছিল বলে তিনি তাদের (সাহাবীদের) তাঁর সাথে ই'তিকাফ চালিয়ে যাওয়া অথবা বের হয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, বলেছিলেন:

«فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ»

"তরাং আপনাদের মাঝে যে ই'তিকাফ করতে পছন্দ করে/চায়, সে যেন ই'তিকাফ করে।"

এছাড়াও ই'তিকাফের অন্যান্য উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন,

১। মানুষের থেকে যথাসম্ভব আলাদা হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে একা হয়ে যাওয়া।

২. আল্লাহ তা'আলার প্রতি সর্বাত্মকভাবে মনোনিবেশ করে আত্মশুদ্ধিকরণ।

৩. সালাত আদায়, দো'আ করা, যিকির পাঠ, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদাত করার জন্য সম্পূর্ণভাবে লেগে যাওয়া।

৪. নাফসের কু-প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা যা সাওমের ওপর প্রভাব ফেলে তা থেকে সাওমকে রক্ষা করা।

৫. দুনিয়াবী মুবাহ বিষয়সমূহ ভোগ কমিয়ে দেওয়া এবং তার অধিকাংশের ব্যাপারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভোগ করার ক্ষেত্রে যুহদ বা কৃচ্ছতা অবলম্বন করা।

দেখুন, আব্দুল লাত্বীফ বালতুব-এর 'ই'তিকাফ শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি' গ্রন্থটি।

ইসলাম কিউ.এ

ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা

ফাতওয়া নং ৪৯০০২

প্রশ্ন: ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় কত? আমি কি অল্প কিছু সময়ের জন্য ই'তিকাফ করতে পারি নাকি একসাথে কিছু দিনের জন্য ই'তিকাফ করতে হবে?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

অধিকাংশ আলেমগণের মতে ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে। আর এটি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহমাদের মত।[103]

ইমাম নববী বলেছেন, "আর ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা সম্পর্কে অধিকাংশ (আলেমগণ) যে মত তাকিদের সাথে পোষণ করেন এবং এটিই সঠিক মত যে এর জন্য মসজিদে অবস্থান শর্ত (অর্থাৎ ই'তিকাফ মসজিদে হতে হবে) এবং তা বেশি বা অল্প সময়ের জন্য হতে পারে, কিছু সময় বা মুহূর্তের জন্যও"।[104]

আর এ ব্যাপারে তারা বেশ কয়েকটি দলীল দিয়েছেন:

১. ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা যা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হতে পারে। আর শরী'আতে এমন কোনো দলীল পাওয়া যায় না, যা কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়।

---

[103] দুররুল-মুখতার (১/৪৪৫), আল-মাজমূ' (৬/৪৮৯), আল-ইনসাফ (৭/৫৬৬)।

[104] 'আল-মাজমূ'' (৬/৫১৪)।

ইবন হাযম বলেছেন, "ই'তিকাফ আরবদের ভাষায়-অবস্থান করা। তাই আল্লাহ তা'আলার মসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোনো অবস্থানই হলো ই'তিকাফ.........সময়সীমা কম হোক বা বেশি হোক, যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি"।[105]

২. ইবন আবী শাইবাহ, ইয়া'লা ইবন উমাইইয়াহ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, "আমি মসজিদে 'সা'আহ' বা কিছু সময় অবস্থান করি আর আমি ই'তিকাফ করার জন্যই অবস্থান করি।" এটি দ্বারা ইবন হাযম-'আল-মুহাল্লা'-তে (৫/১৭৯) দলীল পেশ করেছেন। হাফিয ইবন হাজার 'ফাতহুল বারী'-তে তা উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন (অর্থাৎ কোনো মন্তব্য করেন নি)।

আর সা'আহ হলো সময়ের কিছু অংশ, বর্তমান পরিভাষায় ব্যবহৃত ষাট মিনিটের এক ঘণ্টা নয়। [উল্লেখ্য যে সাম্প্রতিক পরিভাষায় 'আরবীতে এক ঘণ্টা (৬০ মি.)-কে সা'আহ বলে।]

আলেমগণের মধ্যে কারও কারও মতে এর (ই'তিকাফের) সর্বনিম্ন সময় একদিন। এটি ইমাম আবু হানীফাহ'র এক বর্ণনা এবং মালিকী ফিক্বহী মাযহাবে কেউ কেউ এ মত পোষণ করেছেন।

আর শাইখ ইবন বায বলেছেন, "ই'তিকাফ হলো আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা, সময় কম হোক বা বেশি হোক। কারণ, আমার জানা মতে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা একদিন, দুই দিন বা এর বেশি কিছু নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে

---

105 আল-মুহাল্লা (৫/১৭৯)।

নির্দেশনা প্রদান করে। আর তা শরী'আতসম্মত একটি ইবাদাত যদি না কেউ নাযর (মান্নত) করে,-নাযরের (মান্নতের) দ্বারা তা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।”[106]

ইসলাম কিউ.এ

[106] মাজমূ'উল ফাতাওয়া (১৫/৪৪১)।

মসজিদে নারীদের ই'তিকাফ

ফাতওয়া নং ৩৭৬৯৮

প্রশ্ন: একজন নারীর জন্য রমযানের শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করা জায়েয কি না?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হ্যাঁ, একজন নারীর জন্য রমযানের শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করা জায়েয।

বরং ই'তিকাফ নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই সুন্নাত এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ই'তিকাফ করেছেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পরও ই'তিকাফ পালন করেছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭২), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দানের আগ পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ পালন করতেন, তারপর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ পালন করতেন।"

'আউন আল-মা'বূদ গ্রন্থে বলা আছে "এতে দলীল পাওয়া যায় যে ই'তিকাফের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমতুল্য।"

শাইখ 'আবদুল-আযীয ইবন বায বলেছেন,

‘ই‘তিকাফ নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি রমযানে ই‘তিকাফ পালন করতেন এবং সবশেষে তাঁর ই‘তিকাফ শেষ দশদিনে স্থির হয় এবং তাঁর কিছু স্ত্রীগণও তাঁর সাথে ই‘তিকাফ পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মৃত্যুর) পর তাঁর স্ত্রীগণ ই‘তিকাফ পালন করতেন। আর ই‘তিকাফের জায়গা হচ্ছে মসজিদসমূহে, যেখানে জামা‘আতের সালাত আদায় করা হয়।”

(ইন্টারনেটে শাইখ ইবন বাযের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে।)

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

একজন নারীর জন্য তার ঘরে ই‘তিকাফ করা শুদ্ধ নয়

ফাতওয়া নং ৩৭৯১১

প্রশ্ন: একজন নারীর জন্য ঘরে ই'তিকাফ করা জায়েয কিনা? সে কী করবে যদি তার রান্না করার প্রয়োজন পড়ে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ই‘তিকাফ শুধুমাত্র মসজিদে করা বৈধ। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: ١٨٧]

“আর যতক্ষণ তোমরা ই‘তিকাফরত (দুনিয়াবী কাজ থেকে বিরত থেকে নিজেকে ইবাদত ও প্রার্থনার জন্য মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা) অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

এই হুকুম পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইবন কুদামাহ বলেছেন,

‘একজন নারী সব মসজিদে ই‘তিকাফ করতে পারে এবং সে মসজিদে জামা‘আতে সালাত আদায় করতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। কারণ, এটি (জামা‘আতে সালাত আদায়) তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।”[107] আর ইমাম শাফে‘ঈ এই মত পোষণ করেছেন।

নারীর জন্য তার ঘরে ই‘তিকাফ করার বিধান নেই। কারণ, আল্লাহ বলেছেন,

---

[107] আল-মুগনী (৪/৪৬৪)।

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: ١٨٧]

“আর যতক্ষণ তোমরা ই‘তিকাফরত (দুনিয়াবী কাজ থেকে বিরত থেকে নিজেকে ‘ইবাদত ও প্রার্থনার জন্য মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা) অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

এবং রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণ তাঁর কাছে মসজিদে ই‘তিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন।’

ইমাম নববী বলেছেন, “পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য মসজিদের বাইরে ই‘তিকাফ করা শুদ্ধ নয়।”[108]

এটি “আশ-শারহ আল-মুমতি‘” (৬/৫১৩) তে শাইখ ইবন উসাইমীন এই মতই পোষণ করেছেন।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

[108] ‘আল-মাজমূ‘ (৬/৪৮০)।

যাকাতুল ফিতর - এর পরিমাণ এবং তা আদায় করার সময়

ফাতওয়া নং ৪৯৭৯৩

প্রশ্ন: আমরা মরক্কোর একটি সংস্থার সদস্য, বার্সেলোনাতে বাস করি। আমরা কীভাবে যাকাতুল ফিতর হিসাব করব?

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মুসলিমদের ওপর যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন, আর তা হলো এক সা‘ খেজুর বা এক সা‘ জব এবং তিনি সালাতের জন্য অর্থাৎ ঈদের (ফিতরের) সালাতে বের হওয়ার আগে তা আদায় করতে আদেশ করেছেন। আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ».

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তা (যাকাতুল ফিতর) খাদ্যদ্রব্য থেকে এক সা‘ বা খেজুর থেকে এক সা‘ বা জব থেকে এক সা‘ বা কিসমিস থেকে এক সা‘ হিসেবে দিতাম।”[109]

একদল আলেম এই হাদীসে ব্যবহৃত ‘খাদ্যদ্রব্য’ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তা হলো গম (বুর/কামহ)।

আবার অনেকে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এর উদ্দেশ্য হলো সে দেশের অধিবাসীগণ যা খায় তা গম, ভুট্টা, পার্ল মিলেট (pearl millet) বা এছাড়া অন্য যাই হোক না কেন- আর এটি সঠিক মত।

[109] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৩৭

কারণ যাকাত হলো দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি, আর তার (যাকে যাকাত দেওয়া হয়) দেশের খাদ্যদ্রব্য নয় এমন কিছু দিয়ে সহানুভুতি প্রকাশ করা একজন মুসলিমের ওপর ওয়াজিব নয়। আর এতে সন্দেহ নেই যে, চাল- হারামাইনের দেশের (সউদি আরবের) প্রধান খাদ্য, এক উত্তম ও মূল্যবান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত যা বার্লি থেকে উত্তম, যে (বার্লি) হাদীসের পাঠে (মতনে) যথেষ্ট বলে উল্লেখ হয়েছে। তাই এ থেকে জানা গেল যে, চাল দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করায় কোনো দোষ নেই।

ওয়াজিব হলো সকল প্রকার খাবারের এক সা‘ অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিসাব অনুযায়ী এক সা‘ (যাকাতুল ফিতর) আদায় করা। আর এর পরিমাপ হলো স্বাভাবিক দুই পূর্ণ হাতের চার মুঠো, যেমনটি আছে আল-ক্বামূস ও অন্যান্য অভিধানে ওজনের হিসাবে তা ৩ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। যদি কোনো মুসলিম চাল বা তার দেশের খাদ্যদ্রব্য থেকে এক সা‘ দিয়ে (যাকাতুল ফিতর) আদায় করে, তবে আলেমগণের দুই মতের বেশি শক্তিশালী মতানুসারে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে যদিও বা তা এই হাদীসে উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তা ওজনের হিসেবে প্রায় ৩ কিলোগ্রাম দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। আর আলেমগণের ইজমা‘ (ঐকমত্য) অনুসারে গর্ভের ভ্রূণের পক্ষ থেকে তা আদায় করা

ওয়াজিব নয়, তবে 'উসমান-রাদিয়াল্লাহু আনহু (তা) করেছেন বলে মুস্তাহাব।

আর ওয়াজিব হলো ঈদের সালাতের আগেই তা আদায় করা, ঈদের সালাতের পর পর্যন্ত দেরি করা জায়েয নয়। ঈদের আগে এক বা দুই দিন আগে তা আদায় করায় কোনো বাঁধা নেই। তাই এর মাধ্যমে জানা যায় যে, তা আদায়ের সময় শুরু হয় আলেমগণের মতামতের সবচেয়ে সঠিক মতটি অনুসারে ২৮তম রাতে। কারণ, এই (রমযান) মাস ২৯ দিনের হতে পারে আবার ৩০ দিনেরও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যাকাতুল ফিতর ঈদের এক বা দুই দিন আগে আদায় করতেন।

আর যাকাতুল ফিতর দিতে হবে ফকির ও মিসকীনদের। ইবন 'আব্বাস-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন একজন সাওম পালনকারীর অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবিত্রতাস্বরূপ ও মিসকীনদের জন্য খাওয়ার হিসেবে। যে তা ঈদুল ফিতরের সালাতের আগে আদায় করবে, তার পক্ষ থেকে তা কবুল যোগ্য যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর যে তা ঈদুল ফিতরের

সালাতের পর আদায় করবে, তা সাদাকাহসমূহের মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে।"[110]

আর আলেমগণের অধিকাংশের মতে ও দলীলের বিবেচনায় বেশি সঠিক মত অনুসারে মূল্য দ্বারা (অর্থ দিয়ে) যাকাতুল ফিতর আদায় করা সঠিক নয় বরং ওয়াজিব হলো তা খাদ্যদ্রব্য থেকে আদায় করা; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ করেছেন এবং উম্মাতের অধিকাংশই (উলামা) এ মত প্রকাশ করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে চাই যাতে তিনি আমাদের ও সকল মুসলিমদেরকে তাঁর দীনের ফিকহ (বুঝ) ও তার ওপর অটল অবিচল থাকার তাওফীক দেন, আমাদের অন্তরসমূহ ও কাজকর্মকে শুদ্ধ করেন, তিনি তো মহামহিম, পরম করুণাময়।"[111]

কিলোগ্রামের হিসেবে শাইখ ইবন বায-রহিমাহুল্লাহ-এর মতে যাকাতুল ফিত্বরের পরিমাণ–প্রায় ৩ কিলোগ্রাম।

আর এভাবেই ফাতাওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (৯/৩৭১)

শাইখ ইবন উসাইমীন রহ. চাল দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন ২১০০ গ্রাম (অর্থাৎ ২.১ কিলোগ্রাম) [যেমনটি উল্লেখ আছে 'ফাতাওয়া আয-যাকাত' (পৃঃ ২৭৪-২৭৬)-এ]

---

110 আবু দাঊদ, হাদীস নং ১৬০৯ এবং আল- আলবানী একে 'সহীহ আবী দাঊদ' এ হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

111 মাজমূ ফাতওয়া আশ শাইখ ইবন বায (১৪/২০০)

আর এই মতভেদের কারণ হলো, সা‘ পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত, ওজন দ্বারা নির্দিষ্ট নয়।

তবে আলেমগণ তা ওজন দ্বারা হিসাব নির্ধারণ করেছেন কারণ তা হিসাব রাখার ক্ষেত্রে বেশি সহজ ও বেশি বিশুদ্ধ। আর এটি জানা কথা যে শস্যের দানার ওজন ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারণ, তার কোনোটি হালকা আবার কোনোটি ভারী, আবার কোনোটি মাঝারী ওজনের; বরং কখনো আবার একই প্রকার শস্যদানার এক সা‘-এর ওজনও ভিন্ন ভিন্ন হয়। নতুন ফসলের ওজন পুরানো ফসলের ওজন থেকে বেশি হয়। আর তাই যদি কেউ সতর্কতাবশত কিছু বেশি আদায় করে, তবে তা বেশি নিরাপদ ও উত্তম।

দেখুন ‘আল-মুগনী’, (৪/১৬৮)। এতে ফসলের যাকাতের নিসাবের পরিমাণ ওজনের হিসাবে এরূপ উল্লিখিত হয়েছে।

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

দুই ঈদের সালাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো আদর্শ

ফাতওয়া নং ৪৯০২০

প্রশ্ন: আমি দুই ঈদের সালাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো আদর্শ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করতেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইমাম শাফে‘ঈ ‘আল-উম্ম’ এ বলেছেন, “আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের দিন মাদীনার ঈদগাহে যেতেন, তাঁর পরেও সবাই তাই করতেন যদি না তা না করার পেছনে কোনো উযর (অজুহাত) থাকত, যেমন বৃষ্টি ইত্যাদি। অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও তাই করতেন মক্কাবাসীরা ব্যতীত।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে দুই ঈদের সালাত আদায় করতে বের হতেন। তাঁর একটি হুল্লাহ (এক বিশেষ পোশাক) ছিল, সেটি পরে তিনি দুই ঈদ এবং জুমু‘আর সালাত আদায় করতে যেতেন।

হুল্লাহ দুই খণ্ড কাপড় যা একই (জাতীয়) উপকরণে তৈরি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ঈদুল ফিতর-এর সালাত আদায় করতে যাওয়ার আগে খেজুর খেতেন এবং তা বিজোড় সংখ্যায় খেতেন।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ঈদুল ফিতর এর দিন সকালবেলা খেজুর না খেয়ে বের হতেন না, আর তিনি তা বিজোড় সংখ্যায় খেতেন।”[112]

ইবন কুদামাহ বলেছেন,

لا نَعْلَمُ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ اِخْتِلافًا. اِنْتَهَى

“ঈদুল ফিতর -এর দিন তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে ফেলা যে মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে কোনো ভিন্ন মত আমাদের জানা নেই।”

‘ঈদুল ফিতরের দিনে সালাত আদায়ের আগেই খেয়ে ফেলার পেছনে হিকমাহ হলো কেউ যেন এটি না ভাবে যে সালাত আদায় করা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা অপরিহার্য।

এটিও বলা হয়ে থাকে যে, (তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলার পেছনে হিকমাহ হলো) সাওম ওয়াজিব হওয়ার পর সাওম ভঙ্গ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা এর আদেশ পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের জন্য তৎপর হওয়া।

---

[112] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৫৩।

যদি একজন মুসলিম খেজুর না পায়, তাহলে সে অন্য কোনো কিছু, এমনকি পানি দিয়ে হলেও ইফতার করবে যাতে নীতিগতভাবে সুন্নাহ অনুসরণ করতে পারে; আর তা হলো, ঈদুল ফিতর-এর সালাতের আগে ইফতার করা (কিছু খাওয়া বা পান করা)।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ থেকে ফেরার আগ পর্যন্ত কিছু খেতেন না, এরপর তিনি তাঁর জবেহ করা পশুর গোশত থেকে খেতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি দুই ঈদের দিনই গোসল করতেন।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, "এ সম্পর্কে দুইটি দুর্বল হাদীস রয়েছে......তবে ইবন উমার-রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যিনি সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তাঁর থেকে প্রমাণিত যে, তিনি ঈদের দিন বের হওয়ার আগে গোসল করতেন।"

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত আদায় করতে হেঁটে যেতেন এবং হেঁটেই ফিরে আসতেন।

ইবন উমার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ، مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত আদায় করতে হেঁটে যেতেন এবং হেঁটেই ফিরে আসতেন।"[113]

আর আলী ইবন আবী তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

[113] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১২৯৫। আল-আলবানী সহীহ ইবন মাজাহ'তে একে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

«مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا» .

"'ঈদের সালাত হেঁটে আদায় করতে যাওয়া সুন্নাহ।"[114]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন,

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا . . . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَرْكَبَ إِلا مِنْ عُذْرٍ

"অধিকাংশ আলেমগণ এই হাদীস অনুসরণ করেছেন এবং ঈদের দিনে হেঁটে (সালাত আদায়ের জন্য) বের হওয়াকে মুস্তাহাব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ... কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর (অজুহাত) ছাড়া যানবাহন ব্যবহার না করা মুস্তাহাব।"

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈদগাহে পৌঁছতেন, তখন কোনো আযান বা ইক্বামাত বা 'আস-সালাতু জামি'আহ' (সালাত শুরু হতে যাচ্ছে) এরূপ না বলেই সালাত শুরু করতেন, এগুলোর কোনোটি না করাই সুন্নাহ।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে ঈদের আগে বা পরে আর কোনো সালাত আদায় করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা-এর আগে সালাত দিয়ে শুরু করতেন অর্থাৎ খুৎবা পরে দিতেন।

তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত সালাতের প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে কিছু সময় বিরতি নিতেন। দুই

[114] তিরমিযী, হাদীস নং ৫৩০। আলবানী 'সহীহ আত-তিরমিযী'-তে একে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তাকবীরের মাঝখানে বিশেষ কোনো দো'আ পড়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটি ইবন মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত, "তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন, তাঁর সানা' (প্রশংসার পুনরাবৃত্তি) পাঠ করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত (দো'আ) পাঠ করতেন।"

ইবন উমার যিনি সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তিনি প্রতি তাকবীরের সাথে সাথে হাত উঠাতেন।

তাকবীর শেষ করার পর তিনি কিরাত আরম্ভ করতেন। তিনি সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করার পর দুই রাকাতের যে কোনো এক রাকাতে "ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ" (৫০ নং সূরা ক্বাফ) এবং অপর রাকাতে "ইক্বতারাবাতিস সা'আতু ওয়ান শাক্কাল ক্বামার" (৬৪ নং সূরা আল-ক্বামার) পড়তেন। আবার কখনো "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা" (৮৭ নং সূরা আল- আ'লা) ও "হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ" (৮৮নং সূরা আল-গাশিয়াহ) পড়তেন। এই দু'টিই সহীহ বর্ণনাতে পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোনো সূরার কথা সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

কিরাত শেষ করার পর তিনি তাকবীর বলে রুকু করতেন। এরপর সেই রাকাত শেষ করে সাজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানোর পর পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। পাঁচবার তাকবীর দেওয়া শেষ করার পর আবার কিরাত আরম্ভ করতেন। সুতরাং তাকবীরই প্রথম জিনিস যা দ্বারা তিনি প্রত্যেক রাকাত শুরু করতেন। কিরাত শেষ করার পর তিনি রুকু করতেন।

কাসীর ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আওফ থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর বাবা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে যে, "রাসূলুল্লাহ দুই ঈদের সালাতে প্রথম রাকাতে কিরাতের পূর্বে সাতবার তাকবীর দিতেন এবং অপর রাকাতে কিরাতের পূর্বে পাঁচবার তাকবীর দিতেন[115]।"

ইমাম তিরমিযী বলেছেন: "আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে এর চেয়ে সহীহ আর কোনো বর্ণনা নেই।' আর আমিও এই মত পোষণ করি[116]।"

আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শেষ করতেন, তখন তিনি ঘুরে সবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন । সবাই তখন কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, অসিয়ত করতেন, আদেশ করতেন ও নিষেধ করতেন, কোনো মিশন পাঠাতে চাইলে তা পাঠাতেন অথবা কাউকে কোনো আদেশ করতে হলে সে ব্যাপারে আদেশ করতেন।

আর সেখানে কোনো মিম্বার থাকত না যার ওপর তিনি দাঁড়াতেন এবং মাদীনার মিম্বারও আনা হত না; বরং তিনি তাদেরকে মাটির উপর দাঁড়িয়েই খুৎবা দিতেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহর সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুৎবার আগে কোনো আযান এবং ইকামাত ছাড়াই সালাত শুরু

---

115 তিরমিযী, হাদীস নং ৫৩৬। [সম্পাদক]

116 তিরমিযী, আল-'ইলালুল কাবীর, ১/২৮৮। [সম্পাদক]

করলেন। তারপর তিনি বিলালের কাঁধে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিলেন, আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন, মানুষদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে গেলেন, তাদেরকে আদেশ দিলেন ও তাদেরকে (আল্লাহর) বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা-এর দিন ঈদগাহে যেতেন, এরপর প্রথমেই সালাত দিয়ে শুরু করতেন, তারপর তিনি উঠে গিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন, সবাই তখন কাতারে বসে থাকত।"[117]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল খুৎবা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতেন। এমন একটি হাদীসও পাওয়া যায় না যেখানে বলা হয়েছে তিনি দুই ঈদের দুই খুৎবা তাকবীর দিয়ে শুরু করতেন। বরং সা'দ আল-কুরায থেকে বর্ণিত, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন ছিলেন, তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুৎবার মাঝখানে তাকবীর পাঠ করতেন আর দুই ঈদের খুৎবাতে বেশি বেশি করে তাকবীর পাঠ করতেন।"[118]

---

[117] সহীহ মুসলিম।

[118] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১২৮৭।

আলবানী ‘দ‘ঈফ (দুর্বল) ইবন মাজাহ’-তে একে দ‘ঈফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই হাদীসটি দ‘ঈফ হলেও এতে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের খুৎবা তাকবীর দিয়ে শুরু করতেন।

এবং তিনি (আলবানী) ‘তামাম আল-মিন্নাহ’তে বলেছেন, “যদিও এই হাদীস ইঙ্গিত করে না যে খুৎবা তাকবীর দিয়ে শুরু করা শরী‘আতসম্মত, তারপরও এটির ইসনাদ দুর্বল এবং এতে এমন একজন ব্যক্তি বর্ণনাকারী আছেন যিনি দুর্বল এবং অপরজন যিনি অচেনা। তাই একে খুৎবা চলাকালীন সময়ে তাকবীর বলা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নয়।”

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, “দুই ঈদ ও ইস্তিস্কা’ (বৃষ্টি চাওয়ার সালাত)-এর খুৎবা কি দিয়ে শুরু হবে তা নিয়ে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, উভয় (দুই ঈদ ও ইস্তিস্কা’) খুৎবাই তাকবীর দিয়ে শুরু হবে এবং কেউ বলেছেন, ইস্তিস্কা-এর খুৎবা ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দিয়ে শুরু হবে। আবার কেউ বলেছেন, উভয় খুৎবাই (আল্লাহর) প্রশংসা দিয়ে শুরু হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন: “এটিই সঠিক মত... আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সব খুৎবাই আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতেন।”

আর যারা ঈদের সালাতে উপস্থিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বসে খুৎবা শোনা বা চলে যাওয়া উভয়েরই অনুমতি দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবন আস-সা'ইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ».

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সালাত আদায় শেষ করে বললেন, "আমরা এখন খুৎবা প্রদান করছি, তাই যে চায় বসে খুৎবা শুনতে পারে, আর যে চায় সে চলে যেতে পারে।"[119]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন পথ পরিবর্তন করতেন। তিনি এক রাস্তা দিয়ে যেতেন, আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন।"[120]

ইসলাম কিউ.এ

[119] আবু দাউদ, হাদীস নং ১১৫৫। আলবানী একে 'সহীহ আবি দাউদে' সহীহ বলেছেন।

[120] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৮৬।

ঈদে যে ভুলগুলো হয়

ফাতওয়া নং ৩৬৮৫৬

প্রশ্ন: দুই ঈদে যেসব ভুলসমূহ এবং খারাপ কাজগুলোর ব্যাপারে আমরা মুসলিমদের সতর্ক করবো সেগুলো কী কী? আমরা কিছু কাজ দেখি যেগুলো আমরা (দোষ হিসেবে অভিযুক্ত করে) এর বিরোধিতা করি, যেমন, ঈদের সালাতের পরে কবর যিরারত করা এবং ঈদের রাতে রাত জেগে ইবাদত করা ইত্যাদি।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ঈদ ও তার আনন্দ সমাগত হওয়ার সাথে সাথে আমরা কিছু জিনিসের ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে চাই যেগুলো মানুষ আল্লাহর শরী'আতকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে না জেনে করে থাকে। যেমন,

১- ঈদের আগের রাত পুরোটাই ইবাদতের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা শরী'আতসম্মত এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা:

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে, ঈদের রাত ইবাদতের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা শরী'আতসম্মত। এটি এক ধরণের নতুন প্রবর্তিত বিষয় (বিদ'আত), যা কিনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়; বরং এটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যাতে বলা আছে “যে ঈদের রাতে জেগে থাকবে, তার হৃদয় কখনো মারা যাবে না যেদিন সব হৃদয় মারা যাবে।” এটি সহীহ হিসাবে প্রমাণিত হাদীস

নয়। এটি বর্ণিত হয়েছে দুইটি ইসনাদের মাধ্যমে, যার একটি হলো জাল বা বানোয়াট, আর অপরটি হলো খুবই দুর্বল।[121]

তাই অন্য রাতগুলোকে বাদ দিয়ে বিশেষভাবে ঈদের রাত্রিকে কিয়ামের জন্য বাছাই করা শরী‘আতসম্মত নয়। তবে যার ক্বিয়ামের (তাহাজ্জুদ পড়ার) অভ্যাস আছে, সেই ক্ষেত্রে ঈদের রাতে কিয়াম করায় কোনো দোষ নেই।

২- দুই ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা:

এটি ঈদ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, যা কিনা আনন্দ, সুখ ও উল্লাসের প্রকাশ এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবে‘ঈগণের আমলের বিরোধী।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোনো নির্দিষ্ট দিনে কবরস্থানে যাওয়া এবং তাকে একটি উৎসব (ঈদ) বানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নবীর নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমনটি আলেমগণ বলেছেন।

আর এটি কবরসমূহকে উৎসব (ঈদ) হিসেবে গ্রহণ না করা সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। কারণ, বিশেষ কিছু সময়ে ও পরিচিত কিছু মৌসুমে কবর যিয়ারত করা একে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থে পড়ে, এমনটিই আলেমগণ উল্লেখ করেছেন।[122]

---

121 দেখুন- আলবানীর ‘সিলসিলাত আল-আহাদীস আদ-দ‘ঈফাহ ওয়াল-মাউদূ‘আহ” (৫২০, ৫২১)।

122 দেখুন- আলবানীর ‘আহকাম আল-জানাইয ওয়া বিদা‘উহা।’ (পৃঃ ২১৯, ২৫৮)।

৩- জামা'আতে সালাত পরিত্যাগ করা এবং ঘুমিয়ে থাকার কারণে সালাত ছুটে যাওয়া:

এটি খুবই দুঃখজনক, আপনি দেখবেন যে কিছু মুসলিমের সালাত ছুটে যায় এবং তারা জামা'আতের সাথে সালাত পরিত্যাগ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

"আমাদের এবং তাদের মধ্যে চুক্তি হলো সালাত, যে তা পরিত্যাগ করবে সে কুফুরী করল।"[123]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»

"মুনাফিকদের জন্য ইশা এবং ফাজরের সালাত সবচেয়ে বোঝাস্বরূপ। তারা যদি জানত তার মধ্যে (কী কল্যাণ) আছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে (সেই দুই সালাতে) উপস্থিত হত। আর আমি চিন্তা করেছিলাম যে, সালাতের আদেশ করব আর তা কায়েম করা হবে এবং একজন লোককে আদেশ করব যে লোকদের নিয়ে (ইমাম হিসেবে) সালাত আদায় করবে, এরপর আমি আমার সাথে কিছু লোক নিয়ে যাবো যাদের সাথে কাঠের বাণ্ডিল থাকবে,

---

[123] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২১; নাসাঈ, হাদীস নং ৪৬৩। আর আলবানী 'সহীহ আত-তিরমিযী'-তে একে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।

সেই সমস্ত লোকদের কাছে যারা জামা'আতের সালাতে উপস্থিত হয় নি, এরপর তাদের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিব।"[124]

৪- মুসাল্লাতে (সালাতের স্থানে) রাস্তাঘাট কিংবা অন্য কোনো স্থানে পুরুষদের সাথে নারীদের একত্রিত হওয়া আর ঐসব জায়গায় পুরুষদের সাথে তাদের ভিড় জমানো:

এতে আছে মহা ফিতনাহ ও বড় বিপদ। এ ব্যাপারে ওয়াজিব হলো নারী এবং পুরুষ উভয়কেই সতর্কবাণী দেওয়া এবং যতটুকু সম্ভব প্রতিরোধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া। নারীদের পুরোপুরি চলে যাবার আগে পুরুষ ও তরুণদের কখনোই সালাতের স্থান ত্যাগ করা উচিৎ নয়।

৫- কিছু নারীদের সুগন্ধি ও সাজগোজ করে পর্দা ছেড়ে বের হওয়া:

এই সমস্যাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কিছু মানুষ এই ব্যাপারটিকে খুব হালকা ভাবে নেয়। (এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করি।) কিছু নারী যখন তারা তারাউয়ীহ (তারাবীহ), ঈদের সালাত আদায় অথবা অন্য জায়গায় বের হয় তখন তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করে এবং সবচেয়ে সুন্দর সুগন্ধি ব্যবহার করে (আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করুন)। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

[124] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫১।

“যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং লোকজনের পাশ দিয়ে এমনভাবে যায় যাতে তারা তার সৌরভ পেতে পারে সে একজন ব্যভিচারিণী”।[125]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

“জাহান্নামীরা দু’টি শ্রেণিতে আছে যাদেরকে আমি দেখি নি। (১) তারা এমন মানুষ যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে যা দিয়ে তারা লোকদের মারবে এবং (২) এমন নারী যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও বিবস্ত্র থাকে, নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও বিপথে পরিচালনা করে, তাদের মাথা হেলে যাওয়া উটের কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকি এর সৌরভও পাবে না, যদিও এর সৌরভ এই এই দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।”[126]

নারীদের অভিভাবকদেরকে যারা তাদের আশ্রয়ে আছে তাদের ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ এবং আল্লাহ তাদের ওপর যে কর্তৃত্ব করা (এবং ভরণ-পোষণ করার জন্য যে দায়িত্ব) ওয়াজিব করেছেন তা যথাযথভাবে সম্পাদন করার ব্যাপারে। কারণ,

---

[125] নাসাঈ, হাদীস নং ৫১২৬; তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৮৬। আলবানী ‘সহীহ আল-তারগীব ওয়া আত-তারহীব’ (২০১৯) এ একে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

[126] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১২৮।

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ﴾ [النساء: ٣٤]

"পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা (পুরুষেরা) তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

সুতরাং তাদের (নারীদের অভিভাবকদের) উচিৎ তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং যাতে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পরিত্রাণ ও নিরাপত্তা থাকে সেদিকে পরিচালিত করা, তাদেরকে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে রাখা এবং যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে সেটার প্রতি উৎসাহ যোগানো।

৬- হারাম গান শোনা:

বর্তমানে মন্দ কাজগুলির মধ্যে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা হচ্ছে গান-বাজনা। এগুলো খুব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ এই ব্যাপারটিকে হালকা ভাবে নিচ্ছে। এটি এখন টিভি, রেডিও, গাড়ি, ঘরে এবং মার্কেটগুলোতে প্রকট রূপ ধারণ করেছে। লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ (কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া এ সব থেকে ফিরানোর)। এমনকি মোবাইল ফোনও এই মন্দ ও খারাপ জিনিস থেকে মুক্ত নয়। অনেক কোম্পানি আছে যারা মোবাইল ফোনে সর্বাধুনিক মিউজিক টিউন দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং এর সাহায্যে সঙ্গীত এখন মসজিদসমূহে প্রবেশ করেছে, (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)... এটি মহাবিপদ এবং খুবই মন্দ ব্যাপারগুলোর একটি যে আল্লাহর ঘরসমূহে (মসজিদসমূহে) আপনি মিউজিক শুনতে পান। প্রশ্ন নং (৩৪২১৭)

দেখুন। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে, তিনি বলেছিলেন,

«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف»

"আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক এমন থাকবে যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল হিসাবে গণ্য করবে।"[127]

প্রশ্ন নং (৫০০০, ৩৪৪৩২) দেখুন।

তাই একজন মুসলিমের আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ এবং তার জানা উচিৎ তার ওপর আল্লাহর যে নি'আমাত আছে তার জন্য তার শোকর করা কর্তব্য। এটি কখনোই নি'আমাতের শোকর করা নয় যে, একজন মুসলিম তার রাব্বের অবাধ্যতা করবে যিনি তার ওপর অসীম নি'আমাত বর্ষণ করেছেন।

একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা ঈদের আনন্দে মত্ত হয়ে গর্হিত কাজ করছিল, তখন তাদেরকে তিনি বললেন: "যদি তোমরা রমযানে ইহসান (ভালো করে) থাকো তাহলে এটি সেই ইহসানের শোকর করার কোনো পথ নয়। আর যদি তোমরা রমযানে খারাপ করে থাকো, তাহলে রহমানের সাথে যে খারাপ ব্যবহার করেছে, সে এমন করতে পারে না।"

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

[127] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯০।

তার রোগ হয়েছিল যা থেকে আরোগ্য আশা করা যায় না। কিন্তু এরপর আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন।

ফাতাওয়া নং ১০৬৪৭৮

প্রশ্ন: একজন মহিলাকে ডাক্তাররা তার হৃদরোগ জনিত কারণে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছিলেন, যা থেকে সুস্থতা আশা করা যায় নি। তিনি রমযানে ইফতার করে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে সাথে সাথে ফিদইয়াহ আদায় করতেন। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় তার চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং তাঁর হার্টে ভাল্বের সার্জারি করা হয় এবং তা সফল হয় আলহামদুলিল্লাহ্। তবে তিনি এরপর কিছু সময় ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসার অধীনে ছিলেন। এরপর তার অবস্থার উন্নতি হলে আল্লাহ তাকে গত রমযানে সিয়াম পালনের তাওফীক দেন। তিনি জানতে চাচ্ছেন, যে দিনগুলিতে সাওম ভঙ্গ করেছিলেন, সে ব্যাপারে কি করবেন? তিনি কি সেই দিনগুলোর কাযা আদায় করবেন, যার সংখ্যা ১৮০ দিন যা পরপর ছয় বছর এর সমান, নাকি তিনি সে সময় সাওমের পরিবর্তে যে ফিদইয়াহ আদায় করেছিলেন তাই তার জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“তিনি সাওম ভঙ্গ করায় প্রতিদিনের পরিবর্তে যে ফিদইয়াহ আদায় করেছিলেন তা তাঁর জন্য যথেষ্ট। তার সেই মাসগুলোর কাযা করা ওয়াজিব নয়। কারণ তিনি মা‘যূর, (শরী‘আত অনুমোদিত কারণে) সে সময় তার ওপর যা ওয়াজিব ছিল তিনি তা করেছেন।

আল্লাহই তাওফীক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।”

গবেষণা ও ফাতওয়া ইস্যুকারী স্থায়ী কমিটি

শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদিল্লাহ ইবন বায, শাইখ আবদুর রাজ্জাক আফীফী, শাইখ আবদুল্লাহ ইবন গুদাইইয়ান, শাইখ আবদুল্লাহ ইবন কু‘ঊদ।

[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল বুহূস আল-ইলমিয়্যাহ ওয়া আল-ইফতা’ (১০/১৯৫,১৯৬)]

ইসলাম কিউ.এ

বার্ধক্যজনিত বা অসুস্থতার কারণে সাওম পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফিদইয়াহ-এর পরিমাণ।

ফাতাওয়া নং ৯৩২৪৩

প্রশ্ন: আমার বাবা বার্ধক্য জনিত ও অসুস্থতার কারণে অক্ষম হয়ে পুরো রমযান মাসে সাওম ভঙ্গ করেছেন। এরপর সেই সিয়াম এর কাযা আদায় না করেই সেই মাসেই মারা যান। তারপর আমরা দরিদ্রদেরকে অর্থ দানের মাধ্যমে এর কাফফারা আদায় করি। এরপর জানতে পারলাম যে, এই কাফফারা (ফিদইয়াহ) শুধু খাদ্য খাওয়ানোর মাধ্যমেই আদায় করতে হয়। আমাদের কি পুনরায় তার পক্ষ থেকে সেই কাফফারা আদায় করতে হবে এবং এর পরিমাণ কত?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত: ইমাম মালিক, ইমাম শাফে‘ঈ ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল এর অনুসারী ফকীহগণের অধিকাংশের মতে অর্থদানের মাধ্যমে সাওমের ফিদইয়াহ আদায় যথেষ্ট নয়; বরং ওয়াজিব হলো তা খাদ্য দানের মাধ্যমে আদায় করা।

এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: ١٨٤]

“আর যারা তা (সিয়াম) পালনে অক্ষম, তারা ফিদইয়াহ হিসাবে মিসকীন খাওয়াবে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেছেন,

«هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».

“তিনি হলেন অতি বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী যারা সাওম পালনে অক্ষম, তারা উভয়ই প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন।”[128]

“যখন ডাক্তাররা এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে আক্রান্ত রোগের কারণে আপনি সাওম পালন করতে পারবেন না এবং তা থেকে সুস্থতা আশাও করা যায় না, তখন আপনাকে বিগত ও আগত মাসগুলোর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে, যার পরিমাণ হলো দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন খেজুর ইত্যাদি থেকে অর্ধেক সা’। আর যদি আপনি (ছুটে যাওয়া) দিনগুলোর সংখ্যায় একজন মিসকীনকে রাতের বা দুপুরের খাবার খাওয়ান, তবে তা যথেষ্ট হবে। আর অর্থ দানের মাধ্যমে ফিদইয়াহ আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে না।”[129]

বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থতা আশা করা যায় না, তিনি প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবেন। এর পরিমাণ দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন গম অথবা খেজুর অথবা চাল ইত্যাদি এর অর্ধেক সা‘ আর তা প্রায় ১.৫ কিলোগ্রামের সমান।[130]

তিনি সব দিনের ফিদইয়াহ মাসের শেষে একবারে আদায় করতে পারেন। যেমন, ৪৫ কিলোগ্রাম চাল- তা যদি রেঁধে মিসকীনদের দাওয়াত করে খাওয়ানো হয় তবে তা উত্তম কারণ, আনাস রাদিআল্লাহু ‘আনহু এমনটি করতেন।

[128] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫০৫।

[129] ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ (১০/১৯৮)।

[130] দেখুন- ফাতাওয়া রমযান (পৃ. ৫৪৫)।

দ্বিতীয়ত: আর আপনারা যদি কোনো আলেমের ফাতওয়ার ওপর ভিত্তি করে অর্থের দ্বারা ফিদইয়াহ আদায় করে থাকেন, তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

আর যদি আপনারা কাউকে (না জিজ্ঞেস করে) নিজেরা নিজেরাই তা করে থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে পুনরায় (খাদ্যের মাধ্যমে) তা আদায় করা, যা আপনাদের বাবার জন্য বেশি সাবধানের ও নিরাপদ (আল্লাহ তার ওপর দয়া করুন ও তাকে মাফ করুন)।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম কিউ.এ

এদের ওপর কি সাওম পালন ওয়াজিব? তাদের কি কাযা আদায় আবশ্যক?

ফাতওয়া নং ৬৫৬৩৫

প্রশ্ন: এক শিশু বালিগ হওয়ার আগে রমযানের সাওম পালন করত, রমযানে দিনের মাঝে সে বালিগ হলো। তার কি সেই দিনের কাযা আদায় করতে হবে? একইভাবে রমযানে দিনের মাঝে একজন কাফির ইসলাম গ্রহণ করলে, একজন হায়েযপ্রাপ্ত নারী পবিত্র হলে, পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে পায়, মুসাফির ব্যক্তি সাওম ভঙ্গরত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে আসলে, অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হলে (যে সেই দিন সাওম ভঙ্গ করে ফেলেছিল) এ সমস্ত ব্যক্তিদের কি সেই দিনের বাকি অংশ সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ও সেদিনের কাযা আদায় করা ওয়াজিব?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা আলেমগণের ভিন্ন মত ও তাদের বক্তব্য সমূহ কিছুটা বিস্তারিত আকারে (৪৯০০৮) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি।

প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দু'টি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে:

১) কোনো শিশু যদি বালিগ হয়, কোনো কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কোনো পাগল যদি জ্ঞান ফিরে পায়- তবে তাদের সবার হুকুম এক, আর তা হলো ওযর (অজুহাত) চলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের বাকি অংশে সাওম ভঙ্গকারী সমস্ত কিছু হতে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং এক্ষেত্রে তাদের সেই দিনের কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

২) অপরদিকে হায়েযপ্রাপ্ত নারী যদি পবিত্র হয়, মুসাফির ব্যক্তি স্বদেশে ফিরে আসে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে, এদের সবার হুক্ুম এক। এদের সাওম ভঙ্গকারী যাবতীয় বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। কারণ, তারা বিরত থাকলেও কোনো উপকার পাবে না এবং তাদের ওপর সেই দিনের কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য:

প্রথম গ্রুপের মধ্যে তাকলীফের (দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার) শর্ত রয়েছে আর তা হলো বালিগ হওয়া, মুসলিম হওয়া ও 'আক্বল (বুদ্ধি) সম্পন্ন হওয়া, তাই যদি তাদের ক্ষেত্রে শরী'আতসম্মতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাদের ওপর সাওম ভঙ্গকারী সকল কিছু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তাদের জন্য সেই দিনের কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। কারণ, যখন তাদের সাওম ভঙ্গকারী সকল বস্তু হতে বিরত থাকা ওয়াজিব ছিল তখন তারা তা থেকে বিরত থেকেছে এবং এর আগে তারা সিয়ামের ব্যাপারে মুকাল্লাফ (শরী'আতসম্মতভাবে দায়িত্ব) ছিল না।

অপর দিকে দ্বিতীয় গ্রুপটি সিয়াম এর ব্যাপারে শরী'আত সম্মতভাবে দায়িত্বশীল ছিল। তাই তা পালন করা তাদের ওপর ওয়াজিব ছিল, তবে শরী'আত অনুমোদিত ওযর (অজুহাত) থাকায় তাদের জন্য সাওম ভঙ্গ বৈধ হয়েছিল যেমন হায়েয, সফর, রোগ ইত্যাদি কারণে আল্লাহ তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য সাওম ভঙ্গ বৈধ করেছেন। তাই তাদের ক্ষেত্রে সেই দিনের সম্মানীয় কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চলে যায়।

তাদের ওযরসমূহ (শরী'আত অনুমোদিত অজুহাতসমূহ) রমযানে দিনের মাঝে দূরীভূত হলেও তারা সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থেকে কোনো উপকার পাবে না এবং তাদের রমযানের পর সেই দিনের সাওম কাযা করতে হবে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহ. বলেছেন, "যদি কোনো মুসাফির তার দেশে সাওম ভঙ্গরত অবস্থায় ফিরে আসে তবে তাঁর জন্য সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়, সে দিনের বাকী অংশে খেতে ও পান করতে পারে কারণ তার বিরত থাকায় কোনো উপকার হবে না। এটি এজন্য যে, তাঁকে সেই দিনের কাযা আদায় করতে হবে। এটিই সঠিক মত।

এটি ইমাম মালিক ও ইমাম শাফে'ঈ-এর মত এবং ঈমাম আহমাদ রহ. এর দু'টি বর্ণনার একটি। তবে তার প্রকাশ্যে আহার ও পান করা উচিৎ নয়।[131]

তিনি আরও বলেন: "কোনো হায়েযপ্রাপ্ত নারী অথবা নিফাসপ্রাপ্ত নারী দিনের মাঝে পবিত্র হলে তাদের জন্য সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়, সে খেতে ও পান করতে পারে। কারণ, তার বিরত থাকায় কোনো উপকার হবে না। এটি এজন্য যে, তাকে সেই দিনের কাযা আদায় করতে হবে।

এটি ইমাম মালিক ও ইমাম শাফে'ঈ-এর মত এবং ঈমাম আহমাদ-এর দু'টি বর্ণনার একটি।

ইবন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

---

[131] মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)।

من أكل أول النهار فليأكل آخره

“যে দিনের প্রথম অংশে খেল সে যেন দিনের শেষ অংশেও খায়।” ‘অর্থাৎ যার জন্য দিনের প্রথম অংশে সাওম ভঙ্গ করা জায়েয তাঁর জন্য দিনের শেষ অংশেও সাওম ভঙ্গ করা বৈধ।’[132]

এই শাইখকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যে রমযানে দিনের বেলায় শরী‘আত অনুমোদিত ওযরের কারণে সাওম ভঙ্গ করল, (সেই ওযর চলে যাওয়ার পর) দিনের বাকি অংশে তার জন্য খাওয়া ও পান করা কি জায়েয হবে?

তিনি উত্তরে বলেন: “তার জন্য খাওয়া ও পান করা জায়েয। কারণ, সে শরী‘আত অনুমোদিত ওযরে সাওম ভঙ্গ করেছে। সে যদি শরী‘আত সম্মত ওযরের কারণে সাওম ভঙ্গ করে তবে তার ক্ষেত্রে সেই দিনের সম্মানীয় কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চলে যায়। ফলে সে খেতে ও পান করতে পারে।

এটি সেই ব্যক্তির অবস্থা থেকে ভিন্ন যে রমযানে দিনের বেলা কোনো ওযর ছাড়া সাওম ভঙ্গ করে। এক্ষেত্রে আমরা বলব: যে তার সাওম ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে (দিনের বাকি অংশে) বিরত থাকা আবশ্যক। তার ক্ষেত্রে সাওম কাযা করা আবশ্যক হবে।

এই দু’টি মাসআলা এর পার্থক্যের দিকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করা ওয়াজিব।”[133]

তিনি আরও বলেন:

---

[132] মাজমূ‘ ফাতাওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৯/৫৯ নং প্রশ্ন)

[133] মাজমূ‘ ফাতওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)

“সিয়াম সংক্রান্ত আমাদের গবেষণায় আমরা উল্লেখ করেছি যে কোনো নারী যদি হায়েযপ্রাপ্ত হয় এবং রমযানে দিনের মাঝে পবিত্র হয় তবে সে দিনের বাকী অংশে পানাহার থেকে বিরত থাকবেন কি না এ ব্যাপারে আলেমগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

আমরা বলব: ইমাম আহমাদ রহ.-এর থেকে এ-ব্যাপারে দু’টি বর্ণনা রয়েছে।

তার মাশহুর (সর্বজনবিদিত) মতটি হলো- তাঁর সাওম ভঙ্গকারী যাবতীয় বস্তু থেকে দিনের বাকি অংশে বিরত থাকা ওয়াজিব। সে খাবে না, পানও করবে না।

দ্বিতীয়ত: তাঁর বিরত থাকা ওয়াজিব নয়, তাই তাঁর খাওয়া ও পান করা জায়েয।

আমরা বলব: দ্বিতীয় এই মতটি ইমাম মালিক ও ইমাম শাফে‘ঈ রহ.-এর মত। এটি ইবন মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

من أكل أول النهار فليأكل آخره

“যে দিনের প্রথম অংশে খেল সে যেন দিনের শেষ অংশেও খায়।”

আমরা বলব ভিন্ন মত আছে এমন মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষণকারী শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো, দলীলসমূহ যাচাই করা এবং তার কাছে যে মতটি বেশি শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয় সেটি গ্রহণ করা এবং কারও ভিন্ন মতের ব্যাপারে পরোয়া না করা যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে দলীল আছে, কারণ আমাদেরকে রাসূলদের অনুসরণ করতে আদেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলার বাণী:

﴿وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦٥﴾ [القصص: ٦٥]

"আর সেই দিন যখন তাদের আহবান করা হবে এবং বলা হবে তোমরা রাসূলদের কি উত্তর দিয়েছিলে?" [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৬৫]

আর এই হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া যা সহীহ বলে প্রমানিত হয়েছে যে, নবী সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের মাঝে 'আশুরা'-এর সিয়াম পালনের আদেশ করেছিলেন, তখন লোকেরা দিনের বাকি অংশে সাওম ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকলেন।

আমরা বলব, এই হাদীস তাদের পক্ষে কোনো দলীল নয়। কারণ, 'আশুরা' এর সাওমে 'বাঁধা দানকারী বিষয় (যেমন হায়েয, নিফাস, কুফর ইত্যাদি) দূরীভূত হওয়ার' কোনো ব্যাপার নেই; বরং এই ক্ষেত্রে 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' ব্যাপারটি রয়েছে।

'বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়া' ও 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' অর্থ হলো সেই নির্দিষ্ট কারণ (যেমন 'আশুরা' এর দিন) উপস্থিতির আগে সেই হুকুমটি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অপরদিকে 'বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়ার' অর্থ হলো সেই বাধাদানকারী বিষয়টি (যেমন হায়েয, নিফাস, কুফর ইত্যাদি)র উপস্থিতি সত্বেও এই হুকুমটি (যেমন সাওম পালন) প্রতিষ্ঠিত। যদি না এ 'বাধাদানকারী বিষয়টি' (যেমন হায়েয, নিফাস, কুফর) ইত্যাদি তা থেকে বাধা না হতো। আর বিধান প্রদানের কারণ (যেমন, বিবেকবান হওয়া) তার সাথে এই বাধাদানকারী বিষয়টি (যেমন,

হায়েয হওয়া) এটি উপস্থিত থাকার অর্থ হলো সেই কাজটি (সাওম পালন) এই 'বাধাদানকারী বিষয়টির (যেমন হায়েয, নিফাস, কুফর) উপস্থিতির কারণে শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্নকারীর উল্লিখিত মাসআলা-এর মতো আরেকটি উদাহরণ হলো দিনের মাঝে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার ক্ষেত্রে 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব' বর্তায়।

এরকম আরেকটি উদাহরণ হলো, কোনো শিশু দিনের মাঝে সাওম ভঙ্গকারী অবস্থায় বালিগ হলে তাঁর ওপর 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তায়। তাই যে দিনের মাঝে ইসলাম গ্রহণ করল আমরা তাঁকে বলব: আপনার জন্য (দিনের বাকি অংশে) সাওম ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে আপনার ওপর কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

একই ভাবে দিনের মাঝে যে শিশু বালিগ হয়েছে, তাঁকে আমরা বলব: আপনার জন্য (দিনের বাকি অংশে) সাওম ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে আপনার ওপর কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

তবে একজন হায়েযপ্রাপ্ত নারীর ক্ষেত্রে হুকুমটি ভিন্ন হবে। যদি (দিনের মাঝে) সে পবিত্র হয়। আলেমগণের মাঝে এ ব্যাপারে ইজমা' (ঐকমত্য) রয়েছে যে তার ওপর সাওম কাযা করা ওয়াজিব। একজন হায়েযপ্রাপ্ত নারী দিনের মাঝে পবিত্র হয়ে দিনের বাকি অংশে সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকলে, এই বিরত থাকা যে তাঁর কোনো উপকারে আসবে না ও সাওম বলে গণ্য হবে না এবং তাকে

যে সাওম কাযা করতে হবে- এ ব্যাপারে ‘আলেমগণ ইজমা’ (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন।

এ থেকে ‘নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো’ ও ‘বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়ার মধ্যে’ পার্থক্য জানা গেল।

সুতরাং একজন হায়েযপ্রাপ্ত নারী পবিত্র হওয়ার মাস‘আলাটি ‘বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়া’ শীর্ষক শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো শিশুর বালিগ হওয়া অথবা প্রশ্নকারীর উল্লিখিত ‘আশুরা’ দিনের সাওম ওয়াজিব হওয়া (রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে) নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো’ শীর্ষক শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই তাওফীক দাতা।”[134]

ইসলাম কিউ.এ

134 মাজমূ‘ ফাতাওয়া শাইখ ইবন উসাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)

রমযানের কাযা আদায় ও শাউওয়ালের ছয় দিনের সাওম এক নিয়্যাতে এক সাথে আদায় করা শুদ্ধ নয়।

ফাতাওয়া নং ৩৯৩২৮

প্রশ্ন: আমার জন্য কি শাউওয়ালের ছয় দিনের সাওম ও হায়েয জনিত কারণে রমযানে ভঙ্গ হওয়া দিনগুলোর কাযা এক নিয়্যাতে পালন করা জায়েয?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

না, তা শুদ্ধ নয়, কারণ শাওয়ালের ছয় দিনের সিয়াম রমযানের ছুটে যাওয়া সিয়াম পুরোপুরি কাযা না করা পর্যন্ত শুরু হবে না।

শাইখ ইবন উসাইমীনবলেছেন, "যে 'আরাফাতের দিন অথবা 'আশুরা'-এর দিনে সাওম পালন করে এবং তাঁর ওপর রামাযানের সাওম কাযা করা বাকী রয়েছে, তাঁর সিয়াম শুদ্ধ হবে, কিন্তু যদি এই দিনে রমযানের কাযা আদায়ের ও নিয়্যাত করে তবে তাঁর দুই বার সাওয়াব (প্রতিদান) হবে- 'আরাফাতের দিন অথবা 'আশুরা'র দিন সাওম পালনের সাওয়াব ও কাযা আদায়ের সাওয়াব।"[135]

এটি সাধারণ নাফল সাওমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা রমযানের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

তবে শাউওয়ালের ছয় দিনের সিয়াম রমযানের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা রমযানের কাযা আদায়ের পরেই হতে হবে। তাই যদি কেউ কাযা আদায়ের আগে তা পালন করে তবে তার সাওয়াব হবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম বলেছেন,

---

135 'ফাতাওয়া আস-সিয়াম' (৪৩৮)

«من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»

“যে রমযানের সাওম পালন করল, এরপর শাওয়ালের ছয় দিনের সাওম পালন করল, সে যেন গোটা বছর সাওম রাখল।”

আর এটি জানা বিষয় যে, যার ওপর রমযানের কাযা সাওম বাকী রয়েছে, সে রমযান এর সাওম পালন করেছে বলে ধরা হবে না, যে পর্যন্ত না সে তাঁর কাযা সম্পন্ন করে।”

ইসলাম কিউ.এ

কাযার নিয়্যাতে নাফল সিয়াম পালনের হুকুম

ফাতওয়া নং ১১৭৮৪

প্রশ্ন: যদি কোনো মুসলিম নারী সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালনে অভ্যস্থ হয়ে থাকে, তবে কি তার জন্য সেই সিয়ামের দ্বারা রমযান মাসের ফাওত হওয়া (ছুটে যাওয়া দিনগুলোর) কাযা আদায় করার সুযোগ নেওয়া জায়েয নাকি নিয়্যাত স্বতন্ত্র (আলাদা) হওয়া ওয়াজিব?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“রমযান মাসের ছুটে যাওয়া দিনগুলোর কাযা আদায় করতে সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালনে কোনো দোষ নেই এই শর্তে যে, সেই সিয়াম রমযানের কাযা করার নিয়্যাতে হতে হবে। হতে পারে তিনি একসাথে দুই বার সাওয়াব পাবেন- কাযা এর সাওয়াব ও নাফল সিয়াম এর সাওয়াব; আল্লাহর করুণা তো প্রশস্ত।

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে তিনি শুধু কাযা আদায় করতে পারছেন তবে কাযা নাফল সিয়াম থেকে উত্তম, আর যদি তিনি নাফল সিয়ামের নিয়্যাত করে থাকেন এবং কাযা এর নিয়্যাত না করে থাকেন, তবে এর দ্বারা ফরয আদায় হবে না এবং তাকে রমযানে ভঙ্গ করা সাওমগুলোর কাযা আলাদাভাবে করতে হবে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ আমাদের নাবী, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর সালাত (প্রশংসা) বর্ষণ করুন।”

[কিতাব ফাতওয়া ইসলামিয়্যাহ (খন্ড-২, পৃঃ ১৪৯-১৫০), ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ (খণ্ড-১০, পৃঃ ৩৮৩)]

ইসলাম কিউ.এ

ষাট জন মিসকীনকে একসাথে খাওয়ানো (ফিদইয়াহ আদায়) কি ওয়াজিব? নিজ পরিবারকে কি কাফফারা হতে খাওয়ানো যায়?

ফাতওয়া নং ১৩২২৭৩

প্রশ্ন: আমি রমযানে একদিন ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম ভঙ্গ করেছিলাম এবং ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াতে চেয়েছি। এখন প্রশ্ন হলো যে, মিসকীনদেরকে কি একবারেই খাওয়ানো শর্ত না কি আমি প্রতিদিন চার বা তিনজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারি? আমার জন্য কি পরিবারের সদস্যদেরকে (যেমন, আমার বাবা, মা ও ভাইদের) খাওয়ানো (ফিদইয়াহ দান) জায়েয, যদি তারা মিসকীন হয়ে থাকে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“সহবাস বা মিলন ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি রমযানের সাওম ভঙ্গ করা হয়ে থাকে, তবে সঠিক মতটি হলো এর কোনো কাফফারা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো তাওবা করা এবং সেই দিনের সাওম কাযা করা, যদি সাওম শুরু করার পর তা ভাঙ্গা হয়। আর যদি সহবাস/মিলন এর কারণে সাওম ভঙ্গ করা হয়ে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে, তাওবা করা, সে দিনের সাওম কাযা করা এবং কাফফারা আদায় করা- আর তা হলো একজন মুমিন দাস (শরী‘আত অনুমোদিত যুদ্ধলব্ধ) মুক্ত করা। তবে, যে তা পেল না, সে দুই মাস বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করবে; আর যদি সে তাও না পারে, তবে সে ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াবে (সংখ্যা ষাট ই হতে হবে)।

যদি সে পূর্বে উল্লিখিত দাসমুক্তি ও সিয়াম পালনে অক্ষমতার কারণে মিসকীন খাওয়ায় তবে তাঁর জন্য মিসকীনদের একসাথে খাওয়ানো

জায়েয (বৈধ) এবং সাধ্যমত থেকে থেকে কয়েকবারে খাওয়ানোও জায়েয (বৈধ), তবে মিসকীনদের এই সংখ্যা (ষাট) অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

এই কাফফারা এর খাবার বংশমূল যেমন, বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এদের প্রদান করা জায়েয নয়। একইভাবে যার বংশধর শাখা যেমন ছেলেমেয়ে, তাদের ছেলেদের ও মেয়েদের, তঁদেরও প্রদান করা জায়েয নয়।

আল্লাহই তাওফীক দাতা। আল্লাহ আমদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগনের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।”

সমাপ্ত।

[গবেষণ ও ফাতাওয়া ইস্যুকারী আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ]

আশ-শাইখ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আযীয বিন বায, শাইখ আবদুল্লাহ ইবন গুদাইইয়ান, শাইখ সালিহ আল ফাওযান, শাইখ আবদুল আযীয আল শাইখ, শাইখ বকর আবু যাইদ। ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, দ্বিতীয় গ্রুপ (৯/২২১)]

ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, দ্বিতীয় ভাগ (৯/২২১)

শা‘বান থেকে রমযানের পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে সাওম পালন করা

ফাতওয়া নং ৩৮০৪৪

প্রশ্ন: আল্লাহ আমকে মাফ করুন, আমি ধূমপান ত্যাগ করেছি এবং সিয়াম পালন শুরু করেছি ৭ রজব থেকে শা‘বান এর শেষ পর্যন্ত এবং শা‘বান ও রমযানের মাঝে কোনো বিরতি দেই নি। কারণ, এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ফাতওয়া পাওয়া গেছে।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আপনাকে এই হারাম থেকে বিরত থাকার তাওফীক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমাদের ও আপনার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক চেয়ে প্রার্থনা করছি।

আপনার শা‘বান ও রমযান এর মাঝে বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করা জায়েয। এক্ষেত্রে আপনি আপনার এই কাজ দ্বারা সুন্নাতের ওপর আমল করেছেন।

দেখুন প্রশ্ন নং (১৩৭২৬) ও (২৬৮৫০)

ইসলাম কিউ.এ

এটি সাওম বিষয়ক একটি ফাতওয়া সংকলন। যেখানে সাওম, রমযান, রমযানের করণীয়, মহিলাদের সাওমের মাসআলা, তারাবীহ সংক্রান্ত মাসআলা, সাওমের কাযার বিধি-বিধান, যাকাতুল ফিতরের মাসআলাসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলায় সৌদী আরবস্থ বড় বড় আলেম ও সর্ব্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়া তুলে ধরা হয়েছে।